পাতায় পাতায়
গল্প পৃষ্ঠা ৩
কুইজ পৃষ্ঠা ৭
ছড়া-কবিতা পৃষ্ঠা ৮
অবাক খেলা পৃষ্ঠা ১০
কচিপাতা পৃষ্ঠা ১২

কিচির মিচির

১ বর্ষ ৬ প্রস্তুতি সংখ্যা | ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, ১৫ ভাদ্র, ১৪২১ | মোট ১২ পাতা | মূল্য : ১০ (দশ) টাকা

COSMOS GREENCITY
BARASAT
Buy Plot in EMI
Call: 9051285489

১,০০,০০০ বছর পরে মানুষের মুখছবি

এ তুমি কেমন তুমি ?

পার্থপ্রতিম দাশগুপ্ত

ভূপরিবর্তনের ইতিহাসকে বিশেষজ্ঞরা পাঁটটি যুগে ভাগ করেছেন। আমরা যে যুগে বাস করি সেটি নব-ভূতাত্ত্বিক যুগ। ৬.৫০ থেকে ৬.৭০ কোটি বছর ধরে এই যুগটি চলছে। এর আগে রয়েছে মধ্য-ভূতাত্ত্বিক ও প্রত্ন-ভূতাত্ত্বিক যুগ। সবথেকে প্রাচীন যুগ প্রাক-ভূতাত্ত্বিক ও আদিযুগ। আদিযুগের শেষে অতি সাধারণ প্রাণের আবির্ভাব। তখন থেকে এখনকার আমাদের বর্তমানের ব্যবধান ৩০০ কোটি বছর। গবেষকরা জানিয়েছেন, নব-ভূতাত্ত্বিক যুগের শেষ পর্বেই মানবজাতির আবির্ভাব। তোমরা জানলে অবাক হবে, আজ থেকে প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগে বিশেষ এক জাতের বানর খাড়া হয়ে দু'পায়ে হাঁটতে শেখে- তাদের থেকেই মানুষের পূর্বপুরুষ 'পিথেক্যানথ্রোপাস' বা বনমানুষের উৎপত্তি। এদের থেকেই আবার আদিম মানুষের (নিয়ানডারথ্যাল) সৃষ্টি। তোমরা যারা জীবনবিজ্ঞানে বিবর্তন পড়েছ তারা তো জানোই, এছাড়াও সবার জন্যই বলছি, এই সৃষ্টি হঠাৎ করে হয়নি। বহু বহু বছরের বিবর্তনের ফলই মানুষ। আধুনিক মানুষের বয়স প্রায় লক্ষ বছর। আমরা মানুষের অতীত ইতিহাস ঘাঁটতে আসিনি। যে আধুনিক মানুষের ১ লক্ষ বছর আগে উদ্ভব হয়েছিল তাদের অবস্থা এখন থেকে ১ লক্ষ বছর পরে কেমন হতে পারে, তা নিয়ে একটু মজার কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করব।

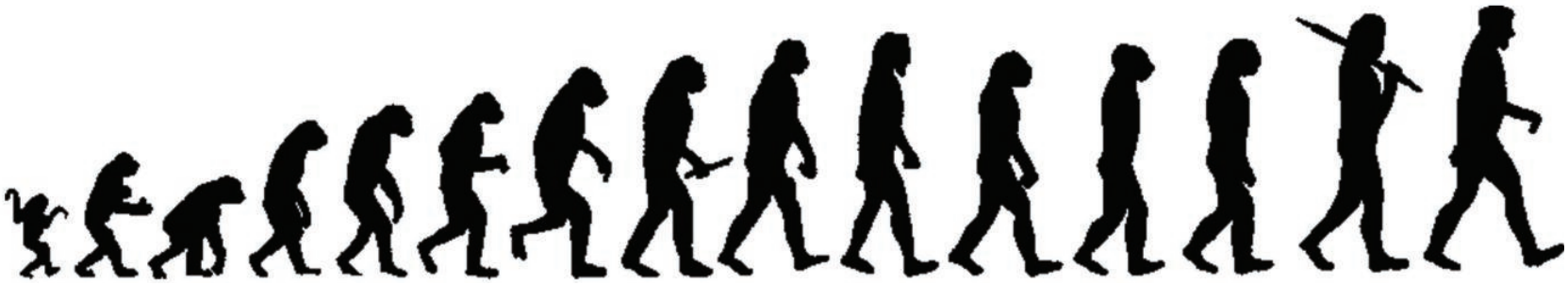

মানুষের পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর থেকে কেটে গিয়েছে বহু বছর। সমাজজীবনে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও বিভিন্ন আবিষ্কার করেছে। ফলে সহজ হয়েছে জীবন, ভবিষ্যৎও অনেক কাছে এসে গিয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ মানেই কিছুটা অজানা। বিজ্ঞান কিছুটা আবিষ্কৃত তথ্য ও কিছুটা ধারণার থেকে অনেক কিছুই আগাম বলে দিতে পারে। যেমন ধরা যাক, ভারত মঙ্গলে যান পাঠিয়েছে। সেই মঙ্গলযান এখনো সেখানে পৌঁছায়নি। কিন্তু কবে পৌঁছাবে বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে আগেই বের করে ফেলেছেন। এই হিসেবের নড়চড় হওয়ার কোনো উপায় নেই। ঠিক একই ভাবে আজ থেকে কয়েক বছর পরের কথা যেমন বলা যায় তেমনই বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আজ থেকে ১ লক্ষ বছর পরে মানুষের মুখ কেমন দেখতে হতে পারে তার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। শুনলে কিছুটা অবাক বা অস্বাভাবিক মনে হলেও সত্যি সত্যি বিজ্ঞানীরা এটা করেছেন এবং সেটা পৃথিবীর বিভিন্ন নামী বিজ্ঞান পত্রিকায় ফলাও করে ছাপাও হয়েছে। এই কাজে যে দু'জন ব্যক্তি মূল উদ্যোগ নিয়েছেন তার মধ্যে প্রথম জন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটেশনাল জিনোমিক্স-এর গবেষক বিজ্ঞানী ডঃ অ্যালান কোয়ান এবং দ্বিতীয় জন শিল্পী-গবেষক নিকোলে ল্যাম।

আসল কথায় আসা যাক। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিনপ্রযুক্তির কথা তোমরা অনেকেই শুনেছো। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই প্রযুক্তি এখন ব্যবহার হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে জিনপ্রযুক্তির ফলে বাড়ানো গিয়েছে উৎপাদন। খারাপ বা প্রতিকূল আবহাওয়ায় চাষোপযোগী বীজ তৈরি, চিকিৎসাবিজ্ঞানে আগাম রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়, বিভিন্ন হারিয়ে যাওয়া বা লুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণি বা উদ্ভিদকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় জিনপ্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই জিনপ্রযুক্তি এবং বিবর্তনবাদের 'ন্যাচারাল সিলেকশন'কে কাজে লাগিয়ে ডঃ কোয়ান এবং নিকোলে ল্যাম তাঁদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

কীভাবে পাওয়া গেল ১ লক্ষ বছর পরের মানুষের সম্ভাব্য মুখছবি?

কাজের শুরুতেই শুরুতেই শিল্পী-গবেষক ল্যাম দু'জন ককেশিয়ান পুরুষ ও মহিলার মুখছবি মডেল হিসেবে ব্যবহার করেন (ছবি-১)। তারপরে কম্পিউটেশনাল জিনোমিক্স-এর জটিল পথ পেরিয়ে ল্যাম আঁকলেন ককেশিয়ান মডেল দু'জনের বেশ *(এরপর ৪ পাতায়)*

এভারেস্ট জয়ীর ডায়েরির পাতা থেকে

পর্বতারোহণের সেকাল ও একাল

দেবদাস নন্দী

গত দুটি সংখ্যা ধরে আমরা পাহাড়ে চড়ার বেশ কিছু উপকরণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই সংখ্যাতেও আমরা আরো কিছু উপকরণ নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমেই বলি টেন্ট বা তাঁবুর কথা। বলার অপেক্ষা রাখে না এই তাঁবু এমনই হতে হবে যাতে আমরা, অভিযাত্রীরা রাতের প্রচন্ড ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। একই সঙ্গে পরের দিন চলবার মতো উপযুক্ত বিশ্রামও নিতে পারি। ১৯৫৩ সালে তেনজিং এবং হিলারি যে তাঁবু ব্যবহার করেছিলেন তাতে হাই-মাউন্টেন পিয়ানো-ওয়্যার স্টিফেনার যুক্ত দরজা এবং অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্য 'নাইলন ইনার্স' ছিল। সেই সময় বেশির ভাগ তাঁবুই ক্যানভাসের মতো বস্তু দিয়ে তৈরি হতো। বর্তমানে যে তাঁবুগুলি ব্যবহার করা হয় তা অতি উচ্চ হিমালয়ের আবহাওয়া সহ্য করতে সক্ষম। 'রিপ-স্টপ কেনপি', কেভলার গাইলাইনস, পলিইউরিফেন পোর্ট উইন্ডো এই তাঁবুকে মাইনাস ৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উষ্ণতাতেও ভিতরের তিনজন পর্বতারোহীকে উষ্ণ রাখতে সক্ষম। এর মধ্যে ভি-ই২৫ টেন্ট উল্লেখযোগ্য।

এরপরে স্লিপিং ব্যাগের কথা। এভারেস্ট অভিযানের সময় ১৯৫৩ সালে যে স্লিপিং ব্যাগ ব্যবহার হতো সেটার ওজন ছিলো ৯ পাউন্ড। কিন্তু সেই স্লিপিং ব্যাগের নাইলন-শেল ইনসুলেশন তেনজিং এবং হিলারিকে এভারেস্ট অভিযানের দীর্ঘ ঠান্ডা রাত্রিতে গরম থাকতে সাহায্য করতো। মজার কথা হচ্ছে এখন যে স্লিপিং ব্যাগ ব্যবহার করা হয় সেটির ওজন ১৯৫৩ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ। এটি -২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উষ্ণতাতেও কার্যকরী। জলরোধী এবং অত্যন্ত হালকা এই স্লিপিং ব্যাগ এভারেস্ট অভিযানের ক্ষমাহীন ঠান্ডার থেকে অভিযাত্রীকে রক্ষা করতে পারে।

এবারে ক্লাইম্বিং অ্যাপারাল-এর কথায় আসা যাক। ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট অভিযান সফল হওয়ার পর হিলারি এবং তেনজিং-এর সঙ্গে থাকা অন্যান্য সদস্য ক্যাম্প-৪-এ ফিরে এসেছিলেন কিন্তু হিলারি এবং তেনজিং তখনও দড়িতে। কটন-ব্লেন্ড ব্যাগি জামাকাপড় তখন ব্যবহৃত হলেও আজকের দিনে অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির ক্লাইম্বিং স্যুট ব্যবহার হয়। ১৯৫৩ সালে হিলারি এবং তেনজিং এভারেস্ট অভিযানের প্রচন্ড ঠান্ডা হাওয়া ও শীতকে প্রতিহত করতে মোটা বাতাসরোধী 'কটন র‍্যাপ-নাইলন ওয়েফ্ট' স্যুট ব্যবহার করেছিলেন। এখন 'স্নরকেল হুড', 'ইন্টারন্যাল ডাউন কলার', 'উইন্ডস্টপার শেল ফেব্রিক'-যুক্ত ক্লাইম্বিং স্যুট ব্যবহৃত হয়। এই নতুন স্যুটগুলো পরে অত্যন্ত বেশি উচ্চতায় মেঘের মধ্য দিয়েও অভিযান চালানো সম্ভব। ১৯৫৩ সালে উলের তৈরি জাম্পার স্যুট ইনসুলেটিং লেয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। স্কটল্যান্ডের একটি কোম্পানি এক বিশেষ ধরণের উল থেকে অভিযাত্রীদের জন্য এই বিশেষ পোষাক তৈরি করে দিত। বর্তমানে যে মিড-লেয়ার পোষাক আমরা ব্যবহার করি সেগুলো শুধুমাত্র উষ্ণতাই দেয় না, একই সঙ্গে শরীরে রক্তসঞ্চালনকেও স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। ১৯৫৩ সালে ডুয়োফোল্ড কোম্পানির তৈরি বিশেষ ধরণের লম্বা অন্তর্বাস তেনজিং এবং হিলারি ব্যবহার করেছিলেন। এই অন্তর্বাস কৃত্রিম তন্তু দিয়ে তৈরি হলেও স্বাভাবিক যেকোনো ফেব্রিকের থেকে ঘামশোষণের মাত্রা অনেক বেশি ছিল। বর্তমানে আমরা যে বেস লেয়ার বা অন্তর্বাস ব্যবহার করি সেটি ফ্ল্যাশড্রাই তন্তু দিয়ে তৈরি। এই বিশেষ তন্তুটির মধ্যে অসংখ্য ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকায় শরীরের থেকে ঘাম অনেক ভালো ভালো বাতাসের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। ১৯৫৩ সালের অভিযাত্রীরা উলের তৈরি স্কার্ফ ব্যবহার করতেন। বর্তমানে কৃত্রিম তন্তু দিয়ে তৈরি এক বিশেষ ধরণের 'বাফ' অভিযাত্রীরা ব্যবহার করে থাকেন যা সুতির নিচে খুব সহজেই খাপ খেয়ে যায়।

১৯৫৩ সালে হিলারি তাঁর বোনের বুনে দেওয়া টুপি মাথায় পরে অভিযানে গিয়েছিলেন। বর্তমানে নাইলনের তৈরি হালকা ফেব্রিকের টুপি বা হ্যাট অভিযাত্রীরা ব্যবহার করে থাকেন যা হিমালয়ের অতি উচ্চতাতেও সূর্যরশ্মি থেকে অভিযাত্রীকে রক্ষা করতে পারে। একই সঙ্গে এই তন্তুগুলো একবিশেষ উপায়ে ও উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি হওয়াতে হাওয়া চলাচলেও কোনো বাধা সৃষ্টি করে না।

পরের সংখ্যায় আমরা অভিযানের যোগাযোগ ব্যবস্থা, খাবার, ক্যামেরা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করবো।

কেন ?

ডাবের জল কাপড়ে লাগলে দাগ ধরে কেন?

শুনলে অবাক হবে, ডাবের জল জামায় কোনো দাগই ফেলে না। কিন্তু ডাব কাটার জন্য ব্যবহৃত দা অথবা কাটারিই দাগের জন্য দায়ি। লোহার তৈরি কাটারি দিয়ে ডাব কাটার সময় ঘটে ছোট্টো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া, আর সেই কারণেই এত ঝঞ্ঝাট। দোষ পড়ে ডাবের জলের। এসো দেখে নিই ডাব কাটার সময় ঠিক কী ঘটে। ডাবের জলের অন্যতম উপাদান 'ট্যানিক অ্যাসিড'। যদিও এই অ্যাসিডের পরিমাণ অত্যন্তই কম। ডাব কাটার সময় লোহার তৈরি কাটারি ডাবের জলের সংস্পর্শে এলেই হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া। লোহার সঙ্গে ট্যানিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় তৈরি হয় 'ফেরোট্যানেট'। এই ফেরোট্যানেট কাপড়ে দাগ সৃষ্টি করে যা সহজে উঠতে চায় না।

কখন

কখন শিংযুক্ত গিরগিটি চোখ থেকে রক্ত ছেটায়?

গিরগিটি সরীসৃপ প্রজাতির প্রাণি। গায়ে আঁশের মতো চামড়াযুক্ত ৩,৮০০ রকমের গিরগিটি পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায়। এদের চারটি পা ও লম্বা লেজ থাকে। পিছনের পা অপেক্ষাকৃত বড়ো ও শক্তিশালী হয় যার জোরেই গিরগিটি চলাফেরা করতে পারে। শিংযুক্ত গিরগিটি (হর্নড লিজার্ড) নিজের আত্মরক্ষার জন্যই চোখ থেকে রক্ত ছেটায়। কোনো প্রাণি আক্রমণ করলে মাথায় রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে দিতে সক্ষম এই গিরগিটি। ফলে উচ্চরক্তচাপে চোখের শিরা ছিঁড়ে যায় ও ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। এই রক্ত প্রায় ১ মিটার দূরত্বে ছুড়তে সক্ষম হর্নড লিজার্ড। এই রক্ত আক্রমণকারীর শরীরে প্রদাহ বা জ্বালা সৃষ্টি করে, এবং সেই সুযোগে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যায় শিংযুক্ত গিরগিটি। বালিয়ারি অঞ্চলে এই গিরগিটির দেখা মেলে।

ফুলপরি ও দুষ্টুলোক

দীপ মুখোপাধ্যায়

ফুলপরি রোজ রাত্তিরবেলা সত্যিকারের পরি হয়ে যায়। কাঁধ থেকে ডানা গজিয়ে ওঠে তার। ফুরফুরে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে যায় ফুলবাগানে। সেখানে আকাশ থেকে চুঁইয়ে পড়ে ফিনফোটা জ্যোছনা। দূর থেকে তাকে বুনোফুলের মতো লাগে। আর মিষ্টি মুখের আলতো হাসিটাও যেন রামধনুর মতো রঙিন। কি তুলতুলে মোলায়েম! ফুলপরির ডানহাতে থাকে একটা প্লাস্টিকের বালতি বোঝাই রামধনু রং। অন্য হাতের মুঠোয় একটা পেল্লায় জাদু তুলি। সেই তুলি বুলিয়ে সে একের পর এক সাদাফুলকে ইচ্ছেমতন রঙিন করে তোলে। কেউ লাল তো কেউ হয় গোলাপি। সারা রাত জেগে ফুলপরি তার আঁকনবাঁকন খেলা চালিয়ে যায়। জবা, অপরাজিতা থেকে শুরু করে ঝোপঝাড়ের পুটুসফুলরাও অধীর অপেক্ষায় থাকে কখন ফুলপরির তুলির ছোঁয়ায় তারা রঙিন হয়ে উঠবে। ফুলপরিও এদিক বাগ থেকে উড়ে যায় সেদিক বাগে। দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই যে তাকে আঁকাআঁকি সেরে ফেলতে হবে। তবেই কীনা আলো ঝলমল সকালে রঙিন পোশাক পরে ঝকমকে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকবে ঘুমভাঙা ফুলরা। তারপর ভোররাতেই ফুলপরি উড়তে উড়তে চলে যাবে নিজের বাড়ির দিকে। ফুলদের রঙিন হয়ে ওঠার এই রহস্য পাড়াপড়শি কেউ জানে না। শুধুমাত্র ফুলরাই এই গোপন কাজের একমাত্র সাক্ষী। কিন্তু ওরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। তাছাড়া ফুলের ভাষা কি আর সব মানুষরা বুঝতে পারে? কক্ষোনো না। প্রতি রাতের মতো সেদিনও ছিল একটা ফুটফুটে রাত। আকাশে জুঁইফুলের মতো হাজার হাজার তারা ফুটে আছে। চাঁদও রূপোলি আলো ঢেলে দিয়েছে এদিকে ওদিকে, সবদিকে। ফুলপরিও ভেসে বেড়াচ্ছে এ বাগান থেকে সে বাগানে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা ধুসরপানা বৃক্ষ বাগান। গাছপালা ঝোপজঙ্গল সব আছে কিন্তু একটা ফুল নেই। লতাপাতারাও কেমন যেন ঝিমিয়ে। এমনকী জ্যোছনাও থমকে গিয়ে ঢুকতে পারছে না সেই বাগানে। ফুলপরি ভাবল, একটাও ফুল যখন নেই এখানে সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না। যেই সে ডানা মেলে উড়ান দিতে যাবে একটা করুণ গোঙানি ভেসে এল তার কানে। কে কাঁদছে এই গভীর রাতে?

এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। বাগানটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। যাতে কেউ না ঢুকতে পারে। আগাছা সরিয়ে তবু দেখার চেষ্টা করল রাতবিরেতে কার মনের গভীর দুঃখগুলো কান্না হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ফুলপরি বাগানে ঢোকার চেষ্টা করতেই একটা ক্ষুদে ঘাসফুল চেঁচান দিল, একদম ঢোকার চেষ্টা কোরো না।

- আমি এই বাগানে ঢুকলে সমস্যাটা কীসের? এখানে কি বাঘ-ভাল্লুক আছে? নাকি সাপ-খোপ কিলবিল করছে?

- তার থেকেও ভয়ংকর একজন দুষ্টুলোকের বাগান এটা। দৈত্যের মতো তাগড়া। লোকটা কিছুতেই চায় না তার বাগানে কোনো ফুল ফুটুক। কুঁড়ি হতে না হতেই সে ছিঁড়ে ফেলে। সে কাউকে ঢুকতেও দেয় না এই বাগানে।

- বলছো কী? প্রজাপতি, মৌমাছি কিংবা গুঁড়ি পিঁপড়েদেরও এখানে প্রবেশ নিষেধ? কী নিষ্ঠুর লোকরে বাবা! কিন্তু আমি যে একটা কান্না শুনতে পাচ্ছি? তখন থেকে কে যেন মনের দুঃখে কেঁদে চলেছে। ব্যাপারটা দেখতে হবে যে। কেউ কাঁদবে আর কেউ হাসবে এটাতো সহজে মেনে নেওয়া যায় না। দুষ্টুলোকটাকে কড়া শিক্ষা দেওয়া দরকার।

ঘাসফুলকে পাত্তা না দিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ফের উঁকি দিল ফুলপরি। আরে! আশ-শ্যাওড়ার ঝোপে লুকিয়ে থাকা পুঁচকে সাদাফুলটা কাঁদছে যে। ফুলটাকে কেমন ম্যাড়মেড়ে লাগছে। কান্নাকাটির ক্লান্তিতে বেচারি নেতিয়ে পড়েছে।

ফুলপরি দরদ দেখিয়ে বলল, ও ফুল, তুমি এমন ভাবে কাঁদছ কেন? কীসের এত কষ্ট তোমার?

তখন সেই ফুল জল টলমল চোখে ফুলপরির দিতে তাকিয়ে বলল, আমি বড়ো একা গো। দেখতেও বিচ্ছিরি। এমন ফুলদের সঙ্গে আড্ডা মারতে প্রজাপতি আর মৌমাছিদের বয়েই গেছে। ওরা তাই অন্য বাগানে রঙিন ফুলদের সঙ্গে খেলতে চলে যায়। আর আমি একা একা মনের দুঃখে কেঁদে চলেছি।

- না সাদাফুল। সবুজপাতা দিয়ে চোখ মুছে নাও। তোমার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি তোমাকে রঙিন করে তুলব। তখন দেখবে কত সুন্দর হয়ে উঠেছ। প্রজাপতি-মৌমাছিরাও ভিড় জমাবে অন্য রঙিন ফুলের মতো।

ফুলপরি যেই বাগানে ঢুকতে যাবে, ক্ষুদে ঘাসফুলের ভয়জড়ানো গলা ফের শোনা গেল, শখ করে বিপদ ডেকে আনছো কিন্তু। দুষ্টুলোক যদি টের পায় ভারী মুশকিলে পড়বে। ভাবতেই পারছ না কী শয়তান ওটা।

- কিন্তু আমাকে তো বাগানে যেতেই হবে। নয়তো দুঃখী সাদাফুলকে রঙিন করে তুলব কী করে?

একটা মধুচুষকি পাখি তখন থেকে ফুলপরিকে লক্ষ্য করছিল। মন দিয়ে তার কথা গিলছিল। বুনো ঝোপটার ফাঁক থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, এই ফুলটি করতে যেওনা। তার চেয়ে আমি চুপিসাড়ে দুষ্টুলোকের ঘরের দিকে গিয়ে দেখে আসি সে জেগে আছে কী না? তারপর না হয় তুমি এই বাগানে ঢোকার চেষ্টা করবে। কি মতলবটা বুঝেছ তো?

ফুলপুরি কোনো বাক্য খরচ করল না। কিছুক্ষণ পর শুনতে পেল উত্তেজিত মধুচুষকির গলা।

- চলে এস মেয়ে। নিজের চোখে দেখে এসেছি দুষ্টুলোক নিদ্রায় ডুবে আছে। নাক ডাকছে ঘড়ঘড় করে। এই সুযোগে কাজ হাসিল করে আসতে হবে। নাও, এবার তোমার রং-তুলি নিয়ে সাদাফুলটাকে রঙিন জামা পরিয়ে দাও।

ফুলপরির মনটা খুশিখুশি হয়ে গেল। আশপাশে যত ঘাসফুল আর প্রজাপতি ছিল তারা সমবেত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সাবধান। খুব সাবধান। দুষ্টুলোক যেন কিছুতেই টের না পায়। ঝটপট তোমার আঁকাআঁকি সেরে ফেলতে হবে।

ফুলপরি এবার বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল সেই বাগানে। ততক্ষণে এক মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছে সাদাফুলের। রঙের বালতিতে তুলি ডুবিয়ে যেই সাদাফুলকে রামধনু রং ছোঁয়াতে যাবে ঘটনাটা ঘটে গেল ঠিক তক্ষুণি।

একটা প্রকাণ্ড হাত তাকে মুঠোয় নিয়ে শূন্যে ঘোরাতে লাগল বনবন করে। তারপর তার মুখটা এগিয়ে এল ফুলপরির দিকে। খড়খড়ে গলায় বলল, কে তুই? বড় সাহস তো? আমার বাগানে চুরি করতে ঢুকেছিস বুঝি?

ফুলপরি তোতলাতে তোতলাতে বলল, আমি এসেছি আড়ালে থাকা দুঃখী সাদাফুলটাকে রামধনু রং বুলিয়ে রঙিন করে তুলতে। এতে তোমার আপত্তি হচ্ছে কেন? তুমি কি চাওনা এই বাগান রঙিন ফুলে ভরে যাক।

- বড়ো আস্পর্ধা তো? এবার তোকেই আমি তোর রঙে চুবিয়ে রঙিন করে তুলব। মজা বুঝবি তখন।

দুষ্টুলোক তখন বালতি ভরা রামধনু রং উপুড় করে দিল ফুলপরির ওপর। তার কুচকুচে মেঘের মতো চুল তখন রামধনুরঙা হয়ে গেছে। গা হাত-পা সব। কিছু রং চুঁইয়ে পড়ল সাদা ফুলটার ওপর। তার মনে আনন্দ ঘুরপাক খাচ্ছে তখন। ফুলপরি একটা গা-ঝাড়া দিল। রামধনু রং ইতিউতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল বাগানময়। গাছে গাছে ফুলে ফুলে। তক্ষুণি সেই বাগানের ঘাসপাতা, গাছপালা, পোকামাকড়, পাখপাখালি এমনকী প্রজাপতি মৌমাছি সবাই রামধনু রঙের হয়ে গেল চোখের নিমেষে। যেখানে রঙের ছিটে পড়েছে সেখানে *(এরপর ৭ পাতায়)*

এ তুমি কেমন তুমি?

(১ পাতার পর)

কিছু ছবি। যার মধ্যে কিছু আজ থেকে ২০ হাজার বছর পরে ঐ দু’জনের মুখ কেমন দেখতে হতে পারে তার ছবি যেমন ছিল তেমনই ছিল আজ থেকে ৬০ হাজার এবং ১ লক্ষ বছর পরের সম্ভাব্য মুখছবিও।

প্রথম ছবিতে দু’জন মডেলের কারোরই মুখে কোনো পরিবর্তন কিছু করা হয় নি। অর্থাৎ সুবিধার জন্য স্বাভাবিক মুখের ছবিই ‘ছবি-১’-এ তুলে ধরা হয়েছে। এবারে দ্বিতীয় ছবির (ছবি-২) কথায় আসা যাক। এই ছবিটিতে সামান্য কিছু পরিবর্তন খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই মাথাটা আগের ছবির (ছবি-১) তুলনায় সামান্য বড়ো। এর কারণ মানুষের মস্তিষ্কের (ব্রেন) আয়তন বৃদ্ধি। যেহেতু যত সময় যাবে মস্তিষ্কের কাজ বাড়বে, তাই মস্তিষ্ক আয়তনেও বাড়বে। অতীতেও বিবর্তনের ফলাফল লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। ছবি-২ তে আর একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উভয় মডেলেরই দু’টি চোখে হলুদ রঙের একটি ‘রিং’ রয়েছে। এটি বর্তমানের ‘গুগল্ গ্লাস’-এর উন্নততর সংস্করণ। এই গ্লাসের মাধ্যমে ছবি তোলা ও তার বিশ্লেষণ, মোবাইলের মতো কথা বলা, কম্পিউটারের মতো কাজকর্ম ও অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা, স্যাটেলাইটের সহায়তায় (অত্যাধুনিক জিপিএস) ম্যাপের সাহায্যে নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয় ইত্যাদি সম্ভব হবে।

ছবি - ২

ছবি - ৩

আসা যাক তৃতীয় ছবির (ছবি-৩) কথায়। এই ছবিতে আজ থেকে ৬০ হাজার বছর পরের মানুষের সম্ভাব্য মুখছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তৃতীয় ছবিতে (ছবি-৩) বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। উভয়েরই মাথা যেমন আয়তনে আরো বড়ো হয়েছে তেমনই চোখগুলিও বড়ো হয়েছে। মনে করা হয়েছে, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য পৃথিবীর উষ্ণতা খুবই বেড়ে গিয়ে মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। ফলে মানুষ সূর্য থেকে দূরে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা কোনো গ্রহে বসতি গড়ে তুলবে। কিন্তু সেখানে আলোর (সূর্যের বিশেষত) অভাবে মানুষের চোখের আকৃতি পরিবর্তিত হবে। একই সঙ্গে নতুন বসতি অঞ্চলে বাতাসে ওজোন স্তর না থাকায় সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি (অতি-বেগুনি রশ্মি) সরাসরি মানুষের ত্বকে ও শরীরে পড়বে। সেই ক্ষতি থেকে বাঁচতে ত্বকে মেলানিন (যেটির উপস্থিতিতে ত্বকের রঙে হেরফের হয়) বেশি পরিমাণে তৈরি হবে। ফলে ত্বকের রঙ গাঢ় হবে। পাশাপাশি একই কারণে চোখের পাতাও অনেক পুরু হবে। সেটাই তৃতীয় ছবিতে (ছবি-৩) তুলে ধরা হয়েছে।

এবার আসা যাক চতুর্থ ছবি (ছবি-৪) প্রসঙ্গে। এটিতে মানুষের মুখ ১ লক্ষ বছর পরে কেমন হতে পারে সেটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, আজ থেকে ১ লক্ষ (!) বছর পরের কথা এখানে সম্ভাবনার স্তরে আলোচিত হচ্ছে।

এই ছবিতে বেশ কিছু নজরকাড়া পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমেই চোখের দিকে তাকানো যাক। চোখ আকৃতিতে বেশ বড়ো, অনেকটা জাপানি-মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের। এর কারণ আগের ছবির সময়েই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মনে করা হয়েছে, লো-লাইট ভিশন মানুষের থাকবে এবং চোখের পাশের দিকেও চোখের পাতা খোলা-বন্ধ হতে পারবে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, এখন আমাদের চোখের পাতা শুধুমাত্র ওপর-নিচেই সামনের দিকে বন্ধ হয়। এই পরিবর্তন ‘প্লাইকা সেমিলুনারিস’-এর পুনর্গঠনের জন্যই সম্ভব হবে বলে ধারণা করা হয়েছে। লক্ষ বছর পরে চোখের এই পরিবর্তন বিভিন্ন ক্ষতিকারক কসমিক রশ্মি থেকে বাঁচার জন্যই বিবর্তনের ফলেই হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ল্যাম এবং কোয়ান চতুর্থ ছবিতে মানুষের নাসারন্ধ্র তুলনামূলকভাবে বড়ো করেছেন; পৃথিবীর বাইরে (অফ-প্ল্যানেট) শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ করতেই এই ব্যবস্থা। পাশাপাশি চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে; মস্তিষ্কের আয়তন বড়ো হওয়ায় শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যাওয়া রুখতে চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে।

যদিও অনেকে এই সম্ভাবনার বিরোধিতা করেছেন। বিরোধী মতের বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের এই পরিবর্তন বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে। তাঁরা বলছেন, বয়স রুখে দেওয়ার পদ্ধতি বিজ্ঞান যদি আবিষ্কার করে ফেলে তাহলে ভবিষ্যতে একজন ৩০ বছরের মানুষের সঙ্গে ৬০ বছরের কোনো মানুষের ফারাক যেমন বোঝা যাবে না, তেমনি লক্ষ বছর পরে মানুষের এই পরিবর্তনও বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। মানুষের চোখ হয়তো চিল বা বাজের মতো শক্তি পাবে; হয়তো মানুষের লোহিত রক্তকণিকা ১০ গুণ বেশি অক্সিজেন বহন করতে পারবে; মানুষের শরীরের লিভার বা যকৃৎ আরো বেশি করে ‘টক্সিন’ বা বিষাক্ত পদার্থ ছাঁকতে পারবে। এইসব পরিবর্তন স্বভাবতই বাইরে থেকে কোনো মতেই বোঝা সম্ভব না। তবে একটা কথা পরিস্কার যে, পরিবর্তন মানুষের হবেই, সেটা বাইরে থেকে বোঝা যাক বা না যাক। গোটা পথিবীতে এই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে অন্য গ্রহে আদৌ বসতি গড়বে না এই পৃথিবীতেই বিবর্তনের মাধ্যমে নিজেকে উপযোগী করে তুলবে তা নিয়েই বিতর্কের শেষ নেই। সেই বিতর্কে না জড়িয়ে বলাই যায়, বিজ্ঞানী ড. অ্যালান কোয়ান এবং শিল্পী-গবেষক নিকোলে ল্যাম একটা ধারণা দিয়ে আমাদের আলোচনা ও মস্কিষ্কের খোরাক যুগিয়েছেন।

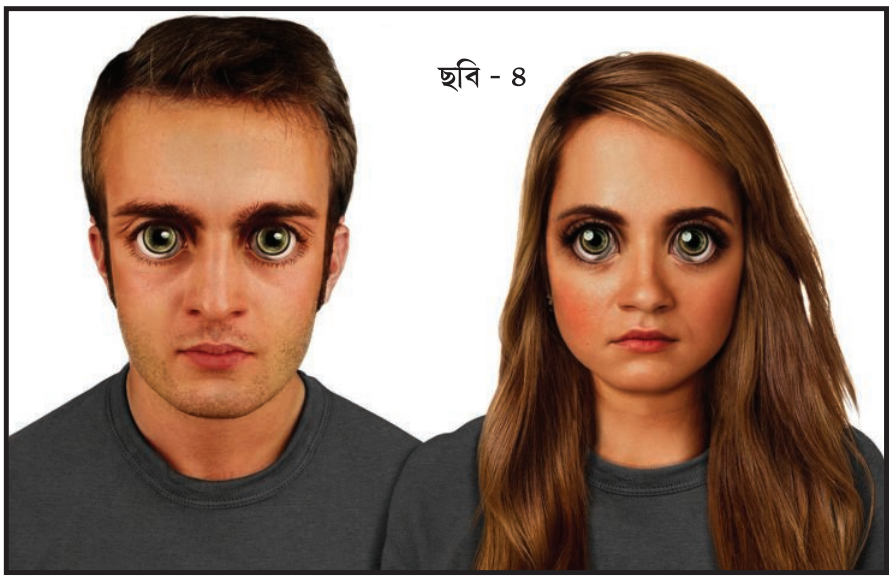

ছবি - ৪

কোথায়

প্রথম ব্লাডব্যাঙ্ক কোথায় গড়ে উঠেছিল?

বেঁচে থাকতে গেলে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন রক্তের, সেটা আদিমযুগে মানুষ বুঝতে শিখেছিল। মানুষের সভ্যতা ও জ্ঞানের পরিধি যতই বেড়েছে রক্ত সম্পর্কে ধারণাও বেড়েছে। একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষের দেহে রক্তদানের কথা প্রথম শোনা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। বহু গবেষণার পর ১৯০০ সালে আধুনিক রক্তবিজ্ঞানের জনক কার্ল ল্যান্ডস্টেনার বলেছিলেন, একজনের রক্ত অন্যজন বা অন্য পশুর রক্ত মানুষ নিতে পারে না। মানুষের রক্তের গ্রুপ ভাগের কথা ও রেসাস ফ্যাক্টরের কথা তিনিই প্রথম বিশ্ববাসীকে জানান।

১৯৩৭ সালে বিশ্বের প্রথম ব্লাডব্যাঙ্কটি গড়ে ওঠে আমেরিকার শিকাগোর কুক কাউন্টি হাসপাতালে। দ্বিতীয় ব্লাডব্যাঙ্কটি কিন্তু তৈরি হয়েছিল কলকাতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল অনেক রক্তের। ডাঃ ইউ এন ব্রহ্মচারীর বিশেষ উদ্যোগ এই ব্লাডব্যাঙ্ক গড়ে তোলার পিছনে ছিল। বর্তমানে কলকাতার মানিকতলার কাছে অবস্থিত সেন্ট্রাল ব্লাডব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় ব্লাডব্যাঙ্কটিই সেইটির বিবর্তিত রূপ।

কবে

প্রথম কলম কবে আবিষ্কার হয়েছিল?

যতদূর জানা গিয়েছে যে প্রথম কলম প্রাচীন মিশরীয়রা বানিয়েছিলেন। একটি ফাঁপা

কাণ্ডের মাথায় তামার টুকরো লাগিয়ে প্রথম কলম, সে বহু বছর আগের কথা। প্রায় ৪ হাজার বছর আগে প্রথম শব্দের লেখা (হ্যান্ড-রাইটিং) লিখেছিলেন গ্রিকরা। কাগজ আবিষ্কারের পরে মানুষ কাক, হাঁসের পালক কালিতে চুবিয়ে কলমের মতো করে ব্যবহার করার বদলে কলমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করলো। আমাদের দেশে খাগের কলমের ব্যবহার ছিল। ১৭৮০ সালে স্টিলের তৈরি কলম প্রথম তৈরি হয়। কিন্তু তার জনপ্রিয়তা পেতে আরো ৪০ বছর কেটে যায়। প্রথম ঝরনা কলম বা ফাউন্টেন পেন ১৮৮০ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ব্যবহৃত হয়। ১৯৩৮ সালে প্রথম ‘বল-পেন’ আবিষ্কার করেন হাঙ্গেরির এক সাংবাদিক, লাদিসলাও বিরো (Ladislao Biro)। ১৯৬২ সালে জাপানে প্রথম ‘ফেল্ট-টিপ’ কলমের ব্যবহার শুরু হয়।

চরৈবেতী বাহাদুর

বাহাদুরের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে (বাঁদিক থেকে) ড. দেবীপ্রসাদ দুয়ারী, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শৈলেন ঘোষ, মনোতোষ দাশগুপ্ত, তাপস চৌধুরী। *ছবি: দেবাশিস দাস*

কিচিরমিচির প্রতিবেদন : সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহে ছোটোদের অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব বাহাদুর ক্লাবেরটো বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে বাহাদুর ক্লাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক শৈলেন ঘোষ, বিড়লা তারামণ্ডলের অধিকর্তা (শিক্ষা) দেবীপ্রসাদ দুয়ারী, প্রথম অসামরিক বাঙালি এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বাহাদুর ক্লাব শিশু-কিশোরদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাডভেঞ্চার মূলক অভিযান করে থাকে।

প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শৈলেন ঘোষ অনুষ্ঠানে বলেন, পরিবর্তিত শৈশবে আজকের শিশুদের আর আগের মতো পড়াশুনার পাশে অন্য কিছু করার সুযোগ কমছে। প্রাচীন কাল থেকেই সৃষ্টির সঙ্গে রয়েছে মানুষ। আগে যে মানুষ গুহাচিত্র আঁকতো, আজকে সেই মানুষই মঙ্গলাভিযান করছে। শুধু জানবার জন্য নয়, ক্রমশ বেড়ে চলা জনসংখ্যাও নতুন বাসস্থান খোঁজার তাগিদ তৈরি করেছে, হচ্ছে পৃথিবীর বাইরেও অভিযান। শৈলেন ঘোষ তার শৈশবের স্মৃতিচারণা করে ফুল ফোটার গল্পের কথা বলেন। ফুলের কুঁড়ির সামনে ফুল ফোটা দেখার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকেও তিনি ফুল ফোটা দেখতে পাননি। এই শিশুসুলভ আচরণ এখনকার শৈশবে আর শিশুরা দেখায় না বলে তিনি আক্ষেপ করেন। তিনি বলেন, এখন শিশুদের কল্পনার জগৎ থেকে বড়োরাই তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমন এক জগতে যেখানে রয়েছে শুধুই অর্থ। লেখাপড়া শিশুরা শিখছে কিন্তু সেটা ভবিষ্যতের অর্থলোভে। এতে অবশ্য শিশুদের কোনো দোষ তিনি দেননি। সমাজের অভিভাবকরাই সঙ্কীর্ন স্বার্থে বাহাদুর ক্লাবের অভিযানের মতো বিষয় থেকে দুরে সরিয়ে দিচ্ছি। বাহাদুর ক্লাবের বিভিন্ন অভিযানের প্রশংসা করা তিনি বলেন, এই ধরনের অভিযান যেমন শিশুমনকে সাহসী করবে, একসঙ্গে থাকার মানসিকতা তৈরি করবে, পৃথিবীকে চিনতে জানতে সাহায্য করবে, ভালবাসতে শেখাবে তেমনই সাবলম্বী হয়ে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচতেও শেখাবে। শৈলেন ঘোষ বলেন, অনেক সময়েই আমরা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-আচার-আচরণকে ভুলে অন্য কোনো জাতির আচার-আচরণ -সংস্কৃতিকে অন্ধ অনুকরণ করে ফেলি। তাতে ক্ষতি আমাদেরই। এমন শিশুই ভালো যে কল্পনা করতে পারে, স্বপ্ন দেখতে জানে, স্বপ্ন দেখতে শিখবে।

অনুষ্ঠানে বিড়লা তারামণ্ডলের অধিকর্তা ড. দেবীপ্রসাদ দুয়ারী বলেন, আজকের দিনে শিশুরা অনেক শূন্যগর্ভ ঝকমকে জিনিষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। শুধু আজকের দিনে নয়, চিরকালই করে। এটাই স্বাভাবিক। বড়োদের কাজ সেই মনভোলানো জিনিস থেকে তাদের আকর্ষণটা সরিয়ে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা। সেই কাজটি বাহাদুরির সঙ্গে, সাফল্যের সঙ্গে একবছর ধরে করতে সক্ষম হয়েছে বাহাদুর ক্লাব। সীমাবদ্ধতা ছেড়ে বাইরে না বেরোলে ভবিষ্যতের দেশ বা সমাজ পরিচালকরা সৃষ্টিশীল হতে পারবে না বলে ড. দুয়ারী উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস আত্মসমালোচনার সুরে বলেন, আমাদের শিশুদের সামনে আজকে অনুসরণযোগ্য, অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিত্বের অভাব রয়েছে। যাঁদেরকে দেখে শিশুরা ভালো সৃষ্টিশীল স্বপ্ন দেখতে, কল্পনা করতে শিখবে তার অভাব রয়েছে। আসলে বড়োদেরই সেইরকম হয়ে উঠতে হবে যাদের দেখে শিশুরা বড়ো হয়ে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে শিখবে। প্রয়াত ছন্দা গায়েনকে স্মরণ করে দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, ওঁর মতো মানসিক জেদ খুব কম জনের দেখা যায়। এই জেদ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সেই জেদ যা মানুষকে এগোতে সাহায্য করে, সেই জেদ শিশুদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই রোপণ করতে হবে। তারপর ওদের উপর ছেড়ে দিতে হবে, বলতে হবে Choose your own peak, climb it। এখানে কোনো ফাঁকিবাজি চলবে না। শপিং মলে খাওয়া দাওয়া করাটা কোনো স্বপ্ন নয়, এমন স্বপ্ন দেখতে হবে যা জেগে দেখতে হয়, যা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

এছাড়া ভারতের মঙ্গলাভিযান নিয়ে আকর্ষণীয় স্লাইড প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করেন ড. দেবীপ্রসাদ দুয়ারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাহাদুরের অদম্য সংগঠকরা, শিশু-কিশোর ও অভিভাবকরা। কিচির মিচির বাহাদুরের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে।

মানুষ হতে হবে

স্বামী শশীশেখরানন্দ মহারাজ

দীর্ঘ ১২ বছর ধরে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছি। আমার ধারণা শুধুই পড়া-লেখা কোনো ছাত্র-ছাত্রীর একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। পড়াশুনা থাকবে, কিন্তু পড়াশুনার মূল উদ্দেশ্য কখনোই অঙ্কে ১০০ পাওয়া নয়। মূল উদ্দেশ্য মানুষের মত মানুষ হওয়া। আজকের দিনে বহু স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী মানুষ রয়েছেন। অনেক MA আমি দেখেছি। কিন্তু MA এর সঙ্গে N যুক্ত থাকা 'MAN' বা 'মানুষ' কম দেখা যাচ্ছে। আমাদের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলতেন, 'জীবনে কিছু Positive দাগ কেটে যেও, তাহলে পৃথিবী তোমায় মনে রাখবে।' সত্যি কথা বলতে কী, আমি সবসময় চেষ্টা করি শিশুদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে পজিটিভ ধারণা দিতে। আমার হাতে যেদিন নখ থাকে সেদিন আমি কোনো ছাত্রকে নখ কাটার কথা বলতে পারি না। আগে নিজেকে ঠিক হতে হয়। তারপর অন্যকে বলা যায়। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। কখনই পিছিয়ে গেলে হবে না, হাল ছেড়ে দিলে হবে না। প্রতিদিন নিজেকে তৈরি করতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমার একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। মনে হয় এই নীতিগল্পের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'একটি পাথর অপর একটি পাথরকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তুমি আর আমি একই শিলাখন্ড দিয়ে তৈরি হওয়া সত্বেও প্রতিদিন আমি হাজার হাজার জুতোর ঘা খাই আর তুমি ফুল-বেলপাতায় সজ্জিত হয়ে সারাদিন পুজো পাও কেন? তখন দ্বিতীয় পাথরটি প্রথম পাথরকে বলে, আসলে তৈরি হওয়ার সময় তোমাকে কোনো কষ্ট পেতে হয়নি। সোজা পাহাড় থেকে এনে তোমাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাকে কারিগররা দিনের পর দিন ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে, সেই আঘাত সহ্য করেছি। কারিগররা কুঁদে কুঁদে আমায় দেবমূর্তির আকার দিয়েছে। এই আকার পেতে আমাকে বহুদিন বহু কষ্ট- আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। তাই আজ তুমি শুধুই পদাঘাত পাও আর আমি ফুলের সুবাস।'

আমার এই নীতিগল্প বলার উদ্দেশ্য একটাই, ছাত্র জীবনে নীতি-আদর্শ মেনে চললে প্রকৃত মানুষ হওয়ার মূল্যবোধ তৈরি হয় যা ভবিষ্যত জীবনের জন্য অত্যন্ত দরকারি। লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির কথা আমরা সবাই শুনেছি, প্রখ্যাত এই চিত্রকরকে একবার রাজা অনুরোধ করেন ভগবানের ছবি আঁকতে। লিওনার্দো বলেন, তিনি কোনোদিন ভগবানকে দেখেন নি তাই তাঁর ছবি আঁকতে অক্ষম, এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রাজা হটাৎ লিওনার্দোকে ডেকে পাঠান। লিওনার্দো দেখেন রাজার এক গির্জার সামনে অবাক নয়নে একটি শিশুর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। লিওনার্দো দেখেন একটি শিশু গির্জার ভেতর স্থির হয়ে বসে প্রার্থনা করছে, তার চোখ-মুখে ফুটে উঠেছে এক অনাবিল আনন্দ। এক অপরূপ স্বর্গীয় শোভা যেন শিশুটিকে ঘিরে রেখেছে। রাজা বলেন, 'লিওনার্দো, এই শিশুই আসলে ভগবান। এই ঘটনার পর বহুদিন-বছর কেটে গেছে। হঠাৎই রাজা আবার লিওনার্দোকে ডেকে পাঠালেন, লিওনার্দো এলেন, দেখলেন রাজা এক রাস্তার অস্ভাবিক ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সেই ব্যক্তি প্রায়োন্মাদের মতো চিৎকার ও গালাগাল করছে। পরনে তার শতছিন্ন ময়লা পোশাক, মুখে দাড়ি ভর্তি, রাস্তার কুকুরের সঙ্গে মারামারি করে খাবার খাচ্ছে ও গালাগাল করছে। রাজা বললেন, এ নিশ্চয়ই শয়তান। হঠাৎই সেই অর্দ্ধোন্মাদ ব্যক্তিটি চিৎকার করে রাজার উদ্দেশে বলে উঠলো, এই আমাকেই ৩৫ বছর আগে তোমরা দেবতা বানিয়েছিলে, আজ বানালে শয়তান। তোমাদের কাছে আজ যে ভগবান কাল সে শয়তান। তোমাদের স্বার্থে তোমাদের ইচ্ছেমতো কাউকে ভগবান কাউকে শয়তান বানাও।

এই নীতি গল্পটি এই কারণে বললাম যে , বাইরের কোনো চটকে প্রভাবিত না হয়ে সবকিছুর অন্তরে ঢুকে তার সারটি বোঝার চেষ্টা করা দরকার। আর এই কাজটির জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে, যেমন মন্দিরের দেবমূর্তির পাথরকে করতে হয়েছিল; যেমন স্বামীজীকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তাঁর মাকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল তেমনই মানুষের মতো মানুষ হতে গেলেও বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ঈর্ষা-দ্বেষ-ঘৃণা ছারতে হয়। স্বামীজীর মতো আদর্শে বলীয়ান হতে হবে। ত্যাগের ব্রত নিয়ে চললে, আদর্শবান হলে সে অবশ্যই ছাত্র হিসেবে সুনাম কুড়াবে। শুধু পড়ার বই নয়, অন্যান্য বইপত্রও পড়তে হবে, যেখান থেকে জ্ঞানার্জন সম্ভব। আগামী সংখ্যায় আমি কীভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আরো ভালো ফল করা যায়, কীভাবে ও কোন সময় পড়তে বসা দরকার তা নিয়ে আমার মতামত হাজির করবো।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

লেখক বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক

গুপ্তধন

বৃষ্টি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ২৭ জুন জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় ম্যাজিস্ট্রেট হলেও যুক্ত ছিলেন সাহিত্যকর্মে। পরিচিতি পেয়েছেন সাহিত্যসম্রাট হিসেবেও। হুগলির মহসিন কলেজে পড়াশুনা শেষ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমস্নাতকদের মধ্যে একজন তিনি। ১৮৫৮ সালে যোগ দেন ব্রিটিশ ভারতের সরকারি চাকরিতে। ১৩টি কালজয়ী উপন্যাস লেখার পাশাপাশি তাঁরই লেখা 'বন্দেমাতরম' ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের স্বীকৃতি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে বিপিনচন্দ্র পাল একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা শুরু করলে বঙ্কিমচন্দ্র তার নাম দেন 'বন্দেমাতরম'। উপন্যাসের পাশাপাশি গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। তাঁর লেখা 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলার প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। একই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ ও কাব্যগ্রন্থ এবং বিজ্ঞান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার মধ্যে কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ইত্যাদি। ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল মাত্র ৫৫ বছর বয়সে এই কালজয়ী সাহিত্যিক প্রয়াত হন।

চল নামি - আষাঢ় আসিয়াছে - চল নামি। যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না - মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি-মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল কেহ একা নামিও না, - অর্দ্ধপথে ঐ প্রচন্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে-চল সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে ঐ বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝর পথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীম বাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে-বায়ু। ঈস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি, তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। যুবতীর যত্ননির্মিত শয্যা ভিজাইয়া দিই-সুষুপ্ত সুন্দরীর গায়ের উপর গা ঢালি। বায়ু! বায়ু তো আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না-ঐক্যই বল-নহিলে আমরা কেহ নই, চল-আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু-কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব-মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব-মনুষ্যের বাণিজ্যে বাঁচিবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব-পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু-আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, নবনীল কাদম্বিনী! বৃষ্টিকুল প্রসূতি! আয় মা দিঙ্মণ্ডলব্যাপিনীঃ সৌরতেজঃসংহারিণী! এসো গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি! এসো ভগিনি সুচারুহাসিনি চঞ্চলে! বৃষ্টিকুলমুখ আলো কর! আমরা ডেকে

ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে, ভূতলে নামি। তুমি বৃত্রমর্মভেদী বজ্র তুমিও ডাক না– এ উৎসবে তোমার মতো বাজনা কে? তমিও ভূতলে পড়িবে? পড়, কিন্তু কেবল গর্ব্বোন্নতের মস্তকের উপর পড়িও। এই ক্ষুদ্র পরোপকারী শস্যমধ্যে পড়িও না – আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত এই পর্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ; পোড়াও ত ঐ উচ্চ দেবালয়চূড়া পোড়াও। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চষিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে—কেবল বেনে বউ আমসী ও আমসত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্, পাপিষ্ঠা! দুই একখানা রেখে যা না —আমরা খাব।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গরস জানি। লোকের চাল ফুটা করিয়া ঘরে উঁকি মারি—দম্পতির গৃহে ছাদ ফুটা করিয়া টু দিই। যে পথে সুন্দর বৌ জলের কলসী লইয়া যাইবে, সেই পথ পিছল করিয়া রাখি। মল্লিকার মধু ধুইয়া গিয়া, ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি—মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রাণী চাকরাণী কাপড় শুকুতে দিলে, প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি । ভন্ড বামুনের জন্য আচমনীয় যাইতেছে দেখিলে, তাহার জাতি মারি। আমরা কি কম পাত্র! তোমরা সবাই বল—আমরা রসিক।

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্বতকন্দর, দেশ প্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নতুন দেশ নির্মান করিব। বিশীর্ণা সূত্রাকারা তটিনীকে কূলপ্লাবিনী দেশমজ্জিনী অনন্তদেহধারিণী অনন্ত তরঙ্গনী জলরাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বাহিব—কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলমগ্ন করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে?

শিক্ষক দিবসের গুরুত্ব

অমিতাভ সেন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেছিলেন -

'তুমি কোন্ কাননের ফুল, তুমি কোন্ গগনের তারা।

শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে ওই নয়নের তারা।'

শুধু রবীন্দ্রনাথের সময়ই নয় আজও সারা ভারতবর্ষে শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানো হয়। প্রতি বছর মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় 'শিক্ষক দিবস'। সমাজকে বিকশিত করতে শিক্ষকদের অতুলনীয় ভূমিকাকে সম্মান জানাতেই শিক্ষক দিবসের প্রয়োজনীয়তা। উল্লেখ্য, ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিনে পালিত হয় শিক্ষক দিবস। কিন্তু এই দিনটিকেই কেন বেছে নেওয়া হল 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে?

ড. রাধাকৃষ্ণাণ ১৮৮৮ সালে ৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন দর্শন শাস্ত্রের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক। স্বাধীনতা লাভের পর উচ্চতর শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রিয় সরকার তাঁর সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। ১৯৪৯ সালে ভারতের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অনেক প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রথম শিক্ষা কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করে। ১৯৫২ সালে রাধাকৃষ্ণাণ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন এবং ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালের ১৩ মে তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত করা হয়। গোটা দেশেই ড. রাধাকৃষ্ণাণের অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী ছিলেন। সেই ছাত্রছাত্রীরা রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণাণের সামনে হাজির হয়ে তাঁর জন্মদিনটিকে মর্যাদার সঙ্গে পালন করার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তাব দেন। উত্তরে ছাত্রছাত্রীদের তিনি বলেছিলেন, 'আমরা প্রথম

এবং প্রধান পরিচয় আমি শিক্ষক। সেজন্য আমরা জন্মদিবসটি যদি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়, সেটাই হবে আমার প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন।' তাঁর ইচ্ছানুসারে কেন্দ্রিয় সরকার কয়েক মাসের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঘোষণা করে ১৯৬২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর উদ্‌যাপিত হবে দেশের সর্বত্র 'জাতীয় শিক্ষক দিবস' এবং পরের প্রতি বছর ঐ দিনটি একই মর্যাদায় পালিত হবে। সেই থেকে আমাদের দেশে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

অন্যদিকে রাষ্ট্রসংঘের শাখা ইউনেসকো দেশ ও সমাজ উন্নয়নে শিক্ষকদের অতুলনীয় ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন ও সজাগ করার জন্য ১৯৯৩ সাল থেকে ৫ অক্টোবর দিনটিকে 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালন করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। যদিও তার বহু আগে থেকেই আমাদের প্রতিবেশী চিন দেশে ২৮ সেপ্টেম্বর দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। যিশু খ্রিস্টের জন্মের ৫৫১ বছর আগে চিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুবিখ্যাত দার্শনিক এবং শিক্ষক কনফুশিয়াস। তাঁর জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর ধরে চিনে এবং পূর্ব এশিয়ায় কয়েকটি দেশে ঐ দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়েছিল।

আমাদের দেশে শিক্ষক দিবসের আলাদা একটি গুরুত্ব আছে শিক্ষার অগ্রগতিতে যেমন প্রয়োজন শিক্ষার পরিকাঠামো, বিদ্যালয় তেমনি প্রয়োজন শিক্ষক এবং ছাত্রের। ইউনেসকোর প্রকাশিত প্রতিবেদন - Education for all by 2015-এর তথ্য অনুযায়ী গোটা দুনিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষায় নিবেদিত মোট শিক্ষকের ১২.৯ শতাংশ, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় নিযুক্ত মোট শিক্ষকের ৯.০৯ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষায় কর্মরত পৃথিবীর মোট শিক্ষকের ৬.১২ শতাংশ আছেন ভারতে। বিশ্বের মোট মানুষের ১৭ শতাংশ এবং সদ্যজাত শিশুর ২৩ শতাংশ আমাদের দেশে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের দেশের তথা রাজ্যের ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীর গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষক দিবসে সেই গুরুত্বই নতুন করে দিতে হবে।

লেখক নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের শিক্ষক

শুরু হয়েছে কুইজ। অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা এবং কচিকাঁচাদের অনুরোধে আমাদের এই বিভাগ **মগজাস্ত্র**। তোমাদের জন্য কলম ধরেছেন **ড. মৌসম মজুমদার।**

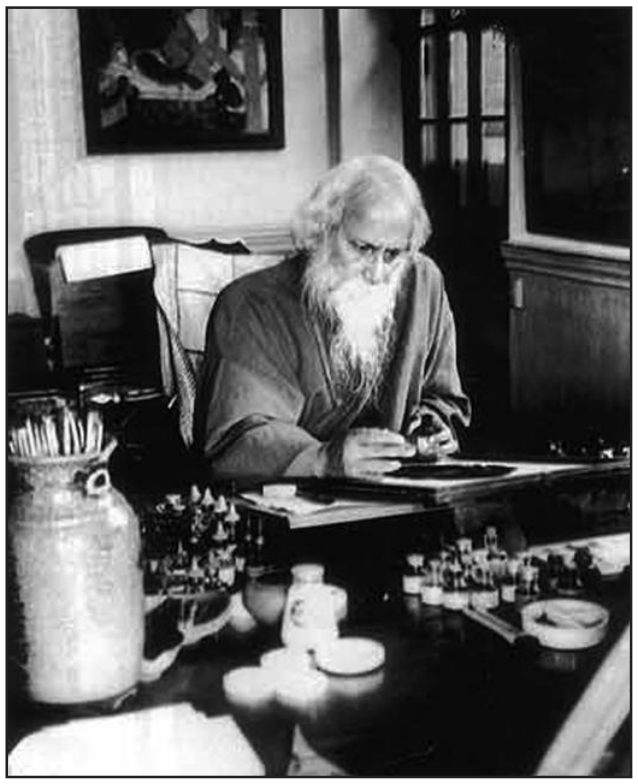

১। কে কত সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পত্তন করেছিলেন?
২। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আসল পদবী কী ছিল?
৩। পিরালী ব্রাহ্মন বাড়ির ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?
৪। রানিগঞ্জে প্রিন্স দ্বারকানাথ কয়লা খনি দেখাশোনার জন্য কোন কোম্পানি খুলে ছিলেন?
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামাতার ৮ ছেলে ও ৭ মেয়ে ছিল, রবীন্দ্রনাথ পিতামাতার কততম সন্তান?
৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কবে হয়েছিল?
৭। রবিঠাকুর ছোটোবেলায় কার কাছে গান শিখতেন?
৮। বাংলার কোন সুপরিচিত খাদ্যকে রবিঠাকুর নামকরণ করেন 'পয়োধি'?
৯। 'সাধনা', 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন', 'ভাণ্ডার', 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাগুলির মধ্যে মিল কোথায়
১০। দিবাকর শর্মা, অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর, আন্নাকালি পাকড়াশি, দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য, ভানু সিংহ, বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় - নামগুলির মধ্যে মিল কোথায়?
১১। কত সালে কবিগুরুকে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করে?
১২। শান্তিনিকেতনের কোথায় আমরা 'উদ্যান', 'গুহাঘর', 'চিত্রভানু', জাপানি বাগিচার বিন্যাস দেখতে পাই?
১৩। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি গীতাঞ্জলি বইটি কাকে উৎসর্গ করেছিলেন?
১৪। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' কাকে উৎসর্গ করা?
১৫। ইংরেজি গীতাঞ্জলির ভূমিকা কে লিখেছিলেন?
১৬। রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' নাটকটি কাকে উৎসর্গ করেছিলেন?
১৭। কবিগুরুর অন্তিমযাত্রার ধারাবিবরণী আকাশবাণীতে কে দিয়েছিলেন?
১৮। প্রতি বছর বিশ্বভারতীতে ১০ মার্চ গান্ধি দিবস পালিত হয় - দিনটির বৈশিষ্ট্য কী?

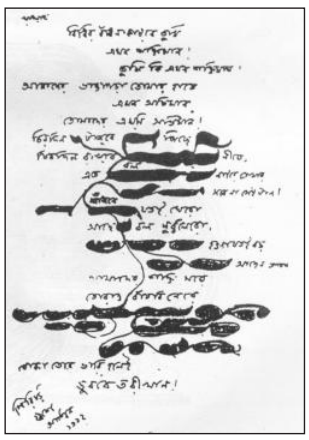

মিলিয়ে নাও

১। নীলমণি ঠাকুর ১৭৮৪ সালে, যিনি ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথের ঠাকুরদা।
২। কুশারী।
৩। ব্রাহ্মধর্ম।
৪। কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি।
৫। চতুর্দশতম।
৬। ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ, ইংরাজির ১৮৬১ সালের ৭ মে, সোমবার, রাত্রি ২টো ৩৮মিনিট ৩৭ সেকেন্ডে।
৭। বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীকণ্ঠ সিংহ -এর কাছে।
৮। মিষ্টি দই।
৯। প্রত্যেকটি পত্রিকার কোনো না কোনো সময়ে সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১০। সবগুলিই রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম।
১১। ১৯৪০ সালের ৭ আগস্ট।
১২। উদয়নে।
১৩। উইলিয়াম রদেনস্টাইনকে।
১৪। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে।
১৫। ডব্লু বি ইয়েটস।
১৬। কাজী নজরুল ইসলাম।
১৭। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।
১৮। ঐ নির্দিষ্ট দিনে প্রতি বছর বিশ্বভারতীর সকল ছাত্রছাত্রীরা সকল কাজের দায়িত্ব নেয় এবং আশ্রমের বেতনভুক কর্মচারীদের ছুটি দেওয়া হয়। ১৯১৫ সালে গান্ধিজি শান্তিনিকেতনে এসে এই নিয়ম চালু করেছিলেন।

আতঙ্ক নয়, অঙ্ক

রামানুজন ও ট্যাক্সিক্যাব সংখ্যা

রামানুজন ও ট্যাক্সিক্যাব সংখ্যা নিয়ে গত সংখ্যাতেই কিছু বলেছি। এই বিষয়টি শেষ করবো আরো সামান্য কিছু উদাহরণ দিয়ে।

ট্যাক্সিক্যাব সংখ্যাকে যতভাবে ঘন'র যোগফল হিসাবে প্রকাশ করা যায় তার ভিত্তিতে ট্যাক্সিক্যাব-১, ট্যাক্সিক্যাব-২, ট্যাক্সিক্যাব-৩ ইত্যাদি নামকরণ করা হয়েছে। এখানে কিছু উদাহরণ তুলে দেওয়া হল।

ট্যাক্সিক্যাব-১ = ২ = $১^৩ + ১^৩$

ট্যাক্সিক্যাব-২ = ১৭২৯ = $১^৩ + ১২^৩ = ৯^৩ + ১০^৩$

ট্যাক্সিক্যাব-৩ = ৮৭৫৩৯৩১৯ = $১৬৭^৩ + ৪৩৬^৩ = ২২৮^৩ + ৪২৩^৩$
$= ২৫৫^৩ + ৪১৪^৩$

ট্যাক্সিক্যাব-৪ = ৬৯৬৩৪৭২৩০৯২৪৮ = $২৪২১^৩ + ১৯০৮৩^৩$
$= ৫৪৩৬^৩ + ১৮৯৪৮^৩ = ১০২০০^৩ + ১১৮০৭২^৩ = ১৩২২২^৩ + ১৬৬৩০^৩$

ট্যাক্সিক্যাব-৫ = ৪৮৯৮৮৬৫৯২২৭৬৯৬২৪৯৬ = $৩৮৭৮৭^৩ + ৩৬৫৭৫৭^৩$
$= ১০৭৮৩৯^৩ + ৩৬২৭৫৩^৩ = ২০৫২৯২^৩ + ৩৪২৯৫২^৩$
$= ২২১৪২৪^৩ + ৩৩৬৫৮৮^৩ = ২৩১৫১৮^৩ + ৩৩১৯৫৪^৩$

ট্যাক্সিক্যাব-৬ = ২৪১৫৩৩১৯৫৮১২৫৪৩১২০৬৫৩৪৪
$= ৫৮২১৬২^৩ + ২৮৯০৬২০৬^৩ = ৩০৬৪১৭৩^৩ + ২৮৮৯৪৮০৩^৩$
$= ৮৫১৯২৮১^৩ + ২৮৬৫৭৪৮৭^৩ = ১৬২১৮০৬৮^৩ + ২৭০৯৩২০৮^৩$
$= ১৭৪৯২৪৯৬^৩ + ২৬৫৯০৪৫২^৩ = ১৮২৮৯৯২২^৩ + ২৬২২৪৩৬৬^৩$

গত দুটি সংখ্যা এবং এই সংখ্যাতেও সংখ্যা নিয়ে কিছু মজার তথ্য তোমাদের সামনে হাজির করেছি। মৌলিক সংখ্যা, ট্যাক্সিক্যাব সংখ্যা, রামানুজন সংখ্যা ইত্যাদির কথা তোমরা ইতিমধ্যেই জেনেছো। পরের সংখায় আমরা পলিড্রন সংখ্যা ও বন্ধু সংখ্যা নিয়ে জানবো।

ফুলপরি ও দুষ্টুলোক

(৩ পাতার পর)

ভোজবাজির মতো গজিয়ে উঠল রামধনু রঙের কচিকাঁচারা। এমনকী দুষ্টুলোকের নাকের ওপর থেকে ঝুলে পড়ল গজিয়ে ওঠা একটা রামধনু রঙের লতা। তাতে ফুটে উঠল বর্ণময় ফুল। শুরু হলো মৌমাছির ভনভনানি। ঠোঁট বাড়াল মধুচুষকি। উড়তে থাকল প্রজাপতি।

দুষ্টুলোকের সবকিছু অসহ্য লাগছে। সে সহ্য করতে পারছে না ফুলের মিষ্টি সুবাস। রাগে গড়গড় করতে করতে সে কোথায় যে পালিয়ে গেল তার খোঁজ কেউ জানে না। তখন রঙ ঝলমলে সেই বাগান মেতে উঠল খুশির উৎসবে। ফুলপরিকে ঘিরে ধরল প্রজাপতির দলবল। মৌমাছি গুনগুন করে উঠল। রামধনু লতারা নরম হাত বুলিয়ে দিল তার ওপর। মধুচুষকি শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে নিল বেশ কয়েকবার। হাওয়া বইতে লাগল ফুরফুর করে।

চাঁদের রুপোলি কলসি থেকে যেন গড়িয়ে পড়ল জ্যোছনার স্রোত। ফুলপরিও তার ডানা নেড়ে নেড়ে নাচতে লাগল সবার সঙ্গে। সেই মায়াবী পরিবেশে ঘাসফুল আর সাদাফুলের গল্প যেন থামতে চায় না। ওরা তো আর বিবর্ণ নেই। কত রঙের যে ছোপ লেগেছে তাদের পাপড়িতে তার কী কোনও ইয়ত্তা আছে?

আকাশ ততক্ষণে নিমরঙা হয়ে উঠেছে। পূবদিকটায় একটু লালচে আভা। রবারের লাল বলের মতো লাফ দিয়ে সূয্যি উঠল বলে। ফুলপরিও একটু ক্লান্ত। তার রাত কাটানোর মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। এক্ষুণি ডানা দুটো হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে উল্ল্ড়ান দিতে হবে নিজের বাসার দিকে। লক্ষ্মী মেয়ের মতো শুয়ে পড়তে হবে নিজের বিছানায়।

উড়তে উড়তে সে দেখল সবাই তাকে হাত নাড়ছে। ফুল পাখি গাছপালা সবাই। রঙিন হয়ে যাওয়া সেই দুঃখী সাদাফুলটা যেন পাপড়ি নেড়ে নেড়ে বলতে চাইছে, ভালো থেকো সই। আবার বেড়াতে এস এই রামধনু বাগানে। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করব কিন্তু। ফের আনন্দে মেতে উঠব সবাই মিলে।

ফুলপরি আকাশ থেকে সেই হাসি মুখগুলো দেখতে পায়। মন ভরে যায় তার। ওরা সবাই যেন তার মতো সুন্দরী হয়ে গেছে। নরম রোদ্দুর পিছলে পড়ছে ওদের গায়ে। এই মনোরম দৃশ্য সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। এর থেকে সুন্দর এই পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না। ভাবতে ভাবতে আস্তে ধীরে মিলিয়ে যায় মেঘের আড়ালে।

অঙ্কন : তাপস সরকার

ছন্দে আনন্দে

স্বপ্নবাড়ি ক্রোক

আকিব শিকদার

বাড়ির দখল আদ্যপান্ত চামচিকাদের হাতে
রাজত্বটা চলছে ভীষণ সকাল সন্ধ্যা রাতে।
দরজা খুলে ঘরের ভেতর যেই দিয়েছি পা,
এমা একি দেখছি কি গো শিউড়ে উঠল গা!
হাতির মতো পেট ফুলিয়ে মস্ত একটা ব্যাঙ
চিৎপটাংটি হয়েই বুঝি দেখায় আমায় ঠ্যাং।
পা চারটে ঠিকই আছে মুখ খেয়েছে কেগো?
চামচিকা না ভূতের এঁটো, বুঝতে পারছি নাগো।
শপাৎ করে গাট্টা একটা কে মেরেছে ঘাড়ে,
চামচিকাদের রাজত্বে তো এমন হতেই পারে।
সিলিঙে আর ছাদে ঝুলে ওরাই ছিল বেশ
অনধিকার চর্চা যেন আমার অনুপ্রবেশ।
ভোগদখলের ফর্দ দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি
চামচিকারা ক্রোক করেছে আমার স্বপ্নবাড়ি।

হুলো-মেনির কথা

সুদীপ্ত ভাণ্ডারী

মিউ-মিউ করে মেনি
পাশে বসে হুলো,
মেনি যত সাদা
হুলো ঠিক তত কালো।
মেনি খায় দুধ-ভাত
হুলোর যে চাই মাছ।
কার বাড়ি গেলে পাবে
খোঁজা শুধু কাজ।
মেনিটা ঠাণ্ডা বটে
হুলো খুব পাজি।
মাছ চুরি করে ব্যাটা
মার খেয়েছে সে আজি।
তাই এতো চুপচাপ
মুখে নেই সাড়া
কতবার বলেছি
পাবি মাছ দাঁড়া।
কথা তবু শোনে কই
লোভে ঘোরে পাড়া
লাঠি হাতে সক্কলে
করে তাকে তাড়া
হুলো তোকে বলি শোন;
লোভ করা ছাড়,
ভালো হলে লোকে তোকে
মারবে না আর।
যে যা দেবে খেতে
মুখ বুজে খাবি,
তখন দেখবি মাছও
ঠিক তুই পাবি।

ছোট্টোকথা

সুমনকুমার সাহু

আমি ছোট্টো বলে একলা ঘরে
পথের পানে চাই
বাইরে যাওয়া মায়ের মানা
পড়ার ঘরে ঠাঁই।
জানলা ধারে উদাস মনে
স্বপ্ন দেখি জেগে
স্বপ্ন পরী ডাকছে মোরে
ঐ নীল পানসি মেঘে।
হিমেল হাওয়া পরশ মেলা
নদীর পাড়ে বসে
পথিক ওগো ক্লান্ত তুমি
জিরাও স্নিগ্ধ প্রাতে।
মেঠো পথে যাচ্ছে গেয়ে
বাউল কবি ভাই
তাই না দেখে মনটা আমার
শুধু উড়তে চাই।
ডানা মেলে যাচ্ছে উড়ে
ছোটন পাখির দল
ঝিলিক ঝিলিক হাসির ছোঁয়া
তারও মাঝে কোন্দল।
বায়না ভুলে ময়না পাখি
বারেক ফিরে চায়
সবুজ টিয়ের নাচন দেখে
কোকিল সুরে গায়।
(আমি) ছোট্টো বলে একলা ঘরে
পথের পানে চাই
বাইরে যাওয়া মায়ের মানা
পড়ার ঘরে ঠাঁই।।

খুশির নাচ

বাসুদেব বণিক

নাক্ ডেঙা ডণ ড্যাং
হাতির পিঠে ব্যাঙ চেপেছে
ভাঙল পড়ে ঠ্যাং
নাক্ ডেঙা ড্যাং ড্যাং।

তাই না দেখে ব্যাঙের মাসি
নেচে নেচে বাজায় কাঁসি
কেলো ভুলো ছুটে এসে
মারল তারে ল্যাং
নাক্ ডেঙা ড্যাং ড্যাং।

ব্যাঙ ব্যাঙাচি খলসে পুঁটি
শোল বোল কই চ্যাং
ভয় করে না সাপের ছোবল
হুলো মিঞাও ম্যা
নাক্ ডেঙা ড্যাং ড্যাং।

● বিদ্যালয়ের একঘেয়েমি ছিল না-পসন্দ

● ক্লাস ছেড়ে কলেজে মায়ের ভুল ধরত

গণিতে বিশ্বসেরা ভারতের মঞ্জুল

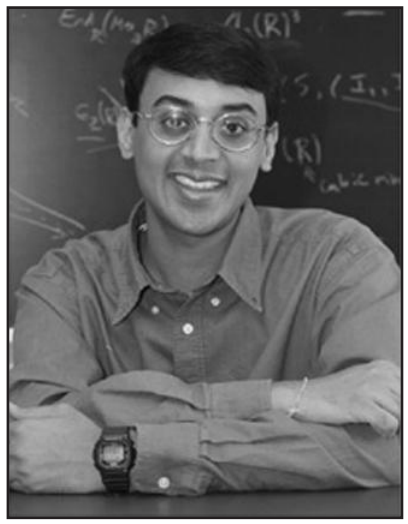

কিচির মিচিরের প্রতিবেদন : দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়ে গণিতে বিশ্বসেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত মঞ্জুল ভার্গব। পেলেন 'ফিল্ডস মেডেল', যেটিকে গণিতে নোবেল প্রাইজের সমতুল্য বলে মনে করেন গবেষকরা। গত ১৩ আগস্ট দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল শহরে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথামেটিক্যাল কনফারেন্স-এর শুরুতেই ভার্গবকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। রীতি অনুযায়ী আয়োজক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কনফারেন্স উদ্বোধন এবং এই বিরল সম্মান প্রদান করে থাকেন। সেই অনুসারে মঞ্জুল ভার্গবের হাতে পুরস্কার তুলে দেন দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি পার্ক গেউইন হাই। মঞ্জুল ছাড়াও আরো ৩ জন গণিতজ্ঞ চলতি বছরে 'ফিল্ডস মেডেল' পেয়েছেন, তাঁরা হলেন ফ্রান্সের আতুর আভিলা, ব্রিটেনের মার্টিন হায়েরার এবং ইরানের মরিয়ম মির্জাখানি। উল্লেখ্য প্রতি ৪ বছর অন্তর অঙ্কের এই বিশ্বসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গত বিশ্ব সম্মেলনটি ভারতের হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতীয় গণিতজ্ঞরা ভাবছিলেন কবে গণিতের এই সেরা শিরোপা মঞ্জুল অর্জন করবে। অনেকে এমন আশাও করেছিলেন হায়দরাবাদ সম্মেলনেই মঞ্জুল এই সম্মান পাবেন। কিন্তু ২০১০ সালের সেই সম্মেলনে মঞ্জুল এই শিরোপা না পাওয়ায় চিন্তায় ছিলেন ভারতীয় গবেষকরা। কারণ বয়স ৪০ পেরিয়ে গেলে এই শিরোপা আর দেওয়া হয় না। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই মঞ্জুল ৪০ পেরিয়েছেন। এই মুহূর্তে মঞ্জুল আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এই ফিল্ডস মেডেলের পুরস্কার মূল্য ১৫ হাজার কানাডিয়ান ডলার।

মঞ্জুলের গবেষণা গণিতের যে অংশকে নিয়ে তাকে বলা হয় নাম্বার থিয়োরি। অঙ্কে তাঁর হাতেখড়ি মা মীরা ভার্গবের কাছে। মঞ্জুলের মা মীরা আমেরিকার নিউইয়র্কের হফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কেরই শিক্ষিকা। তিনি বলেছেন, তিন বছর বয়সের দুষ্টু মঞ্জুল একমাত্র শান্ত থাকতো অঙ্ক পেলে। কাগজ পেন্সিলে নয়, মঞ্জুল মনে মনে অঙ্ক কষতে ভালোবাসতো। বড়ো বড়ো সংখ্যার গুণ বা যোগ অনায়াসে মঞ্জুল ঐ বয়সেই মুখে মুখে করে দিত। এবং সবথেকে বড়ো কথা এমন কিছু পদ্ধতি সেই গণনার সময় ব্যবহার করতো যা সাধারণত কেউ করে না! মাত্র ৮ বছর বয়সে এমন ধাঁধার সমাধান মঞ্জুল করে ফেলে যা কল্পনারও অতীত। কলমালেবু দিয়ে পিরামিড তৈরি করলে কোন উচ্চতায় ক'টা লেবু থাকবে তা বার করতে একটি সূত্র আবিস্কার করে ফেলে মঞ্জুল। সবথেকে মজার কথা, অনেক জিনিয়াসের মতোই মঞ্জুলও বিদ্যালয়ের একঘেয়ে ক্লাস পছন্দ করতো না। ক্লান্তিকর সেই ক্লাস থেকে বাঁচতে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেয় সে। মায়ের সঙ্গে কলেজে অঙ্ক ক্লাসে চলে যেত মঞ্জুল। এমনকী মায়ের অঙ্কের ছোটোখাটো ভুলও ধরে ফেলত স্কুলছুট দামাল এই বালক।

অঙ্কের পাশাপাশি মঞ্জুল সঙ্গীতেও তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন ছোটোবেলা থেকেই। তাঁর গুরু প্রখ্যাত তবলাবাদক

পণ্ডিত জাকির হোসেন। তখন চিন্তা ছিল কী হবেন- গণিতজ্ঞ না সঙ্গীতজ্ঞ। একসঙ্গেই চালিয়ে গিয়েছেন সঙ্গীতচর্চাও, শেষ পর্যন্ত গণিতকেই 'মেজর' হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত জাকির-শিষ্য মঞ্জুল এবং আশানুসারে চলতি বছরেই তিনি লাভ করলেন গণিতে বিশ্বসেরার অনন্য শিরোপা।

'কচি পাতা'র পাতায় পাঠাতে পারো তোমাদের লেখা ছড়া, অণুগল্প, লিমেরিক বা তোমাদের কোনো অভিজ্ঞতার কথা। আমরা গুরুত্ব দিয়ে ছাপবো সেই লেখা। পাঠাতে পারো ছবিও।
লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা -
কিচির মিচির
৯ কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১। পাঠাতে পারো ই-মেলেও।

(আগে যা ঘটেছে - বুডো আর জুডো নামের দুই কালো চিতাবাঘকে গুহার বাইরে পাহারায় রেখে মিটিং করতে ঢোকে দুষ্টু শকুন খটাখট। বৈজ্ঞানিক পানিনির তৈরি এক অভিনব যন্ত্র কানে লাগিয়ে গুহার ভেতরের সব কথা শুনে ফেলে জুডো আর বুডো। তারা জেনে যায় গুহার ভেতরে রয়েছে এক অজানা মহারাজ যে কিনা ঈগল রাজার মুকুট হাতিয়ে সবুজ পাহাড়ের রাজা হতে চায়। এদিকে সবুজ পাহাড়ের গুপ্তচর বুদ্ধিমান বাদুড় ফুড়ুৎ জুডো বুডোর কথা শুনে জানিয়ে দেয় গিরগিটিকে, যে ছোটে বুড়ো মৌমাছির কাছে, খবরটাকে সংকেত বানিয়ে সবুজ পাহাড়ের পাঠাতে। বুমবুম নতুন সাইকেল শিখতে গিয়ে মুশকিলে পড়ে। অদৃশ্য কেউ পিছন থেকে ধরে থেকে বুমবুমকে সাইকেল শিখিয়ে দেয়। কিন্তু সাইকেল শেখার আনন্দে বুমবুম ভুল দিকে সাইকেল চালিয়ে ফেলে আর ঘোষদের বাড়ির হোঁৎকা ছেলেটাকে ধাক্কা মারে। তারপর পরিচয় হয় ইচ্ছেভূতের সঙ্গে। বিশ্বকাপ নিয়ে কথাও হয় ইচ্ছেভূতের সঙ্গে।

"হ্যাঁ, নাম জান ওনার?"

"হ্যাঁ, উইকিপিডিয়াতে দেখেছি। খালি পায়ে খেলতেন।"

"ঠিক, খালি পায়ে গোরাদের এমন মজা দেখাতেন যে ওরা ভয়ে পালিয়ে যেতো। তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো। বাবার ট্যাবটা নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাটি কর, তাই না?" বলল ইচ্ছেভূত।,

বুমবুমের খুব ভালো লেগে গেল ইচ্ছেভূতকে। ও হেসে বলল, "হ্যাঁ, আমার এটা ওটা দেখতে আর জানতে খুব ভালো লাগে। বই-এর সাথে সাথে দিদির ল্যাপটপ আর বাবার ট্যাবএও দেখি। আচ্ছা, গোরা কাদের বলে?"

হাহাহাহা করে হেসে উঠল ইচ্ছেভূত। তারপর বলল, "বুমবুম, তোমার মনে দেখি অনেক প্রশ্ন। থেকো, এই রকমটাই থেকো। গোরা মানে হল ইংরেজ। মানে ইংল্যান্ডের লোক। সে এক লম্বা গপ্পো। পরে শোনাবো। এদিকে যে ডিংগোবাবু তোমাকে পাগল ভাবছে। ভাবছে তুমি হাওয়ার সাথে কথা বলছো।'

কথায় কথায় ডিংগোর কথা ভুলেই গেছে বুমবুম। পাশে তাকিয়ে দেখে ডিংগো অবাক হয়ে দেখছে ওকে। বুমবুম বলল, "আমি সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলছি রে ডিংগো, যে সাইকেলটা ধরে ছিল। ও আসলে ইচ্ছেভূত। তোকে বাড়িতে গিয়ে ওর কথা বলব।"

শুনে ডিংগো আরও অবাক হয়ে গেলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল, যেন কাউকে খুঁজছে।

বুমবুম ইচ্ছেভূতের কাছে জানতে চাইল, "আচ্ছা, তোমাকে কি একটু দেখা যায় না? তাহলেই ডিংগো আমাকে পাগল ভাববে না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইচ্ছেভূত বলল, "তোমার দেখি অনেক বুদ্ধি! অমনি টুক করে আমাকে দেখে ফেলবে। অত সহজে কি আমাকে দেখা যায়? তবে তুমি খুব ভালো, সময় এলে আমি ঠিক দেখা দেব। এখন চোখটা বন্ধ কর দেখি।"

"কেন?" অবাক হয়ে জানতে চাইল বুমবুম।

"আরে করোই না। আর ডিংগোবাবুর চোখটাও ঢেকে দাও।"

ডিংগোর চোখটা ঢেকে বুমবুম চোখ বন্ধ করতেই ওর গায়ে লাগল এক দমকা হাওয়া। তারপরেই কানে এল ইচ্ছেভূতের গলা, 'চোখ খোলো বুমবুম।"

চোখ খুলে বুমবুমের চোখ ছানাবড়া! ও আর ডিংগো দাঁড়িয়ে আছে ওদের বাড়ির সামনে! সাইকেলটাও রয়েছে সঙ্গে। এ যে ম্যাজিক!

ডিংগোর চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিল বুমবুম। সামনে তাকিয়ে ডিংগোও অবাক!

ইচ্ছেভূতের গলা শোনা গেল আবার, "মেসির খেলাটা জমিয়ে দেখ বুমবুম। সেই জন্যই তোমাকে দিয়ে গেলাম বাড়িতে। এটাই তো ইচ্ছে ছিল তোমার। এখন আসি, দরকার হলে মনে মনে আমার কথা ভেব, ঠিক চলে আসব। টা টা।" এই বলে ইচ্ছেভূত চলে গেল।

সাইকেল নিয়ে বুমবুম আর ডিংগো ঢুকল বাড়িতে। দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল বুমবুম। আর পাঁচ মিনিটেই শুরু হবে আজকের ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল ম্যাচ!

তোমাদের জানিয়ে দি, বুমবুমের সাইকেল নিয়ে ভয়ের এখানেই ইতি, পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল ডিংগোর সঙ্গে রেস রেস খেলা।

।।২।।

পাথুরে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে গিরগিটি যখন বুড়ো মৌমাছির বাসায় পৌঁছাল তখন ভোর হয়ে গেছে। বুড়ো মৌমাছি একটা নতুন ফুলের মধুর সঙ্গে অনেক রকম গাছের পাতার রস মিশিয়ে একরকম টনিক তৈরি করছিল।

গিরগিটিকে দেখে বলল - "ব্যাপার কী, গিরগিটি মশাই? কোনো গোপন খবর আছে নিশ্চয়ই।"

গিরগিটি হুড়মুড় করে বলতে গিয়ে হাঁপাতে লাগল।

"আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, আগে একটু জিরিয়ে নাও। পাহাড়ী রাস্তায় সারারাত হেঁটে শরীরে কি কিছু অবশিষ্ট আছে?"-গিরগিটিকে থামিয়ে দিয়ে বলল মৌমাছি।

তারপর একটা ছোট্ট বাটিতে নতুন টনিকটা একটু ঢেলে গিরগিটির হাতে দিয়ে বলল, "নাও, আমার তৈরি এই নতুন টনিকটা খেয়ে ফেল দেখি। খেলেই গায়ে অনেক জোর পাবে। তারপর শুনি কি ব্যাপার।"

বুড়ো মৌমাছি মন দিয়ে সবটা শুনল। তারপর গুনগুন শব্দে ধরল গান -

আয়রে আয় পাজী,
তুই ছোট্টো মৌমাছি।
নাচিয়ে ডানা সাজিয়ে দিবি
দুষ্টু ফুলের সাজি।

সঙ্গে সঙ্গে কাছের মৌচাক থেকে উড়ে এল একজন শ্রমিক মৌমাছি। বুড়ো মৌমাছিকে নমস্কার করে বলল, "বলুন বাবামশাই, কী সঙ্কেত বানাতে হবে?"

(আবার পরের সংখ্যায়)

অবাক খেলা

অলক চট্টোপাধ্যায়

খেলাধুলোয় লড়াই আছে, থাকবেও। কিন্তু হিংসুটেপনার কোনো সুযোগ নেই। কেউ কেউ 'কিচির মিচির'-র প্রথম সংখ্যায় এই ধারাবাহিক লেখায় শুধুই ফুটবলের উল্লেখ থাকার জন্য মৃদু অভিযোগ করেছেন। সবিনয়ে জানাই কোনো বিশেষ ভাবনায় ফুটবলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু কথা যখন উঠেছে, তখন এবার থেকে শুধুই ফুটবল নয়, নানা ধরনের খেলার উল্লেখ এই পাতায় থাকবে। এবং ছোটো-বড়ো ঘটনাগুলোর একটা শিরোনামও দেওয়া হবে।

বয়স কত?

বিশ্বকাপে দল নির্বাচনের সময় খেলোয়াড়দের দক্ষতা-যোগ্যতা দেখে নেওয়া হয়। অভিজ্ঞতার দিকেও নজর দেওয়া হয়। অনভিজ্ঞ তরুণ দলকে বিশ্বকাপে খেলতে পাঠানোর প্রশ্নে একদা এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল ঘানা। ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ঘানা দলটির গড় বয়স ছিল মাত্র ২৪।

জিম লেকারের প্রথম উইকেট এবং ...

টেস্ট ক্রিকেটের বিখ্যাত অফ-স্পিনের ইংল্যান্ডের জিম লেকার (যিনি এখনও পর্যন্ত একটি টেস্টে সর্বাধিক (১৯) সংখ্যক উইকেট দখল করেছেন) প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর প্রথম উইকেটটা পেয়েছিলেন একটা অদ্ভুত ভঙ্গির ক্যাচ ধরার জন্য। ফিল্ডার এ আর গ্রোভারকে সেই ক্যাচটি ধরতে সাহায্য করেছিল তার সোয়েটারটি। মাঠে দাঁড়িয়ে গোভার যখন সোয়েটার-এ মাথা গলিয়ে সেটা পরছিলেন সেই মুহূর্তে লেকারের বলে তোলা ক্যাচটা তাঁর কাছে চলে আসে। গ্রোভার তখন সোয়েটারের মধ্যে দু-হাত গলিয়ে সেটা ঠিক করে পরতে ব্যস্ত। ক্যাচ ততক্ষণে উঁচু আকাশ থেকে নেমে গ্রোভারের দুই হাঁটুর একটু ওপরের কাছাকাছি চলে এসেছে। সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির সংমিশ্রণে গ্রোভার কাচটা তাঁর দুটো পা কাছাকাছি এনে বলটাকে মাঝখানে আটকে দিয়েছিলেন।

ফুটবল ভালোবেসে

উস্তাদ ব্যাটসম্যান এভার্টন উইকস ওয়েস্ট ইন্ডিজের সুবিখ্যাত 'থ্রি ডব্লু'-র মধ্যে একজন হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ডব্লুদের অন্য দুজন - ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ও ক্লাইভ ওয়ালকট। এভার্টন-এর বাবা ছিলেন ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব 'এভার্টন ফুটবল ক্লাব'-এর প্রবল সমর্থক। সেই কারণেই তিনি ছেলের নাম রেখেছিলেন 'এভাটন'।

পেলের স্বদেশপ্রেম

ফুটবলের চিরস্মরণীয় তারকা ব্রাজিলের 'পেলে' চারটি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিলেন (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৭০)। পেশাদার ফুটবলার হিসেবে তাঁর জীবনের সেরা দিনগুলোয় তিনি কেবল একটা ক্লাবের পক্ষেই খেলেছিলেন সেটি ব্রাজিল-এর 'স্যান্টোস' (Santos)। সেই গৌরবময় দিনগুলোয় ইউরোপের যে চারটি ক্লাব পেলেকে নিজেদের দলে খেলাতে চেয়েছিল, তাদের যেকোনও একটার পক্ষে খেলতে পারতে দুনিয়ার কোনও একজন তারকা নিজেকে ধন্য মনে করবেন। সেই ক্লাবগুলো ছিল - রিয়েল মাদ্রিদ (স্পেন), জুভেন্তসে (ইতালি), ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড (ইংল্যান্ড) ও এ সি মিলান (ইতালি)।

ব্রাজিল ব্রাজিল

ফুটবল-রসিক মানেই সে ব্রাজিলের সমর্থক এমন একটা জনপ্রিয় ধারণা আছে। মারাদোনার আর্জেন্টিনা খ্যাতিতে উজ্জ্বল হওয়ার পরেও ব্রাজিলের জনপ্রিয়তা কমেনি। ফুটবলরে ইতিহাস বলে ব্রাজিল-এর সঙ্গে ফুটবলের পরিচয় করিয়েছিলেন একজন ইংরেজ, তাঁর নাম চার্লস মিলার (Charles Miller)। কিন্তু সেখানেও তৈরি হয়েছে পুরনো প্রবাদ - 'ইংরেজরা ফুটবল খেলাটা আবিষ্কার করেছে ঠিকই, কিন্তু ব্রাজিলের মানুষরাই ফুটবল শিল্পটাকে ঠিকঠাক চেহারা দিয়েছে ('The English invented it, the Brazilian perfected it')।

গরিলা নয়

একদা টেস্ট ক্রিকেটের দ্রুততম ফাস্টবোলার ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জো টমসম (Jeff Thomson)। ভয়াবহ গতিতে বল করতেন বলে ব্যাটসম্যানরা তাঁকে ভয় পেতেন। একবার টমসন নিজের সম্পর্কে সবিনয়ে বলেছিলেন - 'আমি কোনও গরিলা নই। সত্যি বলতে, আমি একজন শান্ত প্রকৃতির মানুষ।'

খেলার চাল লিখে রাখো ...

পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে দাবা চর্চায় মন দিলে পড়াশোনার উন্নতি হয়, জানাচ্ছেন গবেষকরা। **চেস্ দাদু** তোমাদের সামনে যেমন বিভিন্ন বিশ্বখ্যাত দাবাড়ুদের কথা তুলে ধরবেন তেমনি থাকবে রাজ্যের ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত দাবা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

সম্প্রতি বিশ্ব ফুটবলের আসর বসেছিল ব্রাজিলে। এই সুযোগে ব্রাজিলের পেলের নাম মনে আসবেই। আর অন্য একজন যাকে দাবা জগতের পেলে বলা হত তিনি হলেন ব্রাজিলের গ্র্যান্ডমাস্টার Henrique Mecking। তাঁকে কেউ কেউ ব্রাজিলিয়ান ফিশার নাম দিয়েছেন। বুঝতেই পারছ Bobby Fisher-এর নাম যার সাথে যোগ করা যায় তিনি কত বড়ো দাবাড়ু। এই মেকিং-এর জন্ম হয় ব্রাজিলের সান্তাক্রুজসোল নামে এক জায়গায়। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি দাবা খেলা শেখেন। যদিও ১৯৭৯ সালে এক কঠিন রোগে তিনি অসুস্থ হওয়ার জন্য সেইভাবে দাবা জগতে আর ফিরতে পারেননি। দাবা খেলাতে শরীর ঠিক রাখতে হবে এবং মানসিক সঞ্চালন ঠিক রাখার জন্য এটা খুব প্রয়োজন। একজন দাবাড়ু বসে বসে খেলেন। কিন্তু বলা হয় একটা উন্নত পর্যায়ের দাবা খেলা কয়েক রাউন্ড বক্সিং লড়ার সমান। পৃথিবীতে অনেক বালক প্রতিভা দাবা জগতে এসেছে। আজ এমন একজনের কথা বলবো যাকে দাবা জগত কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। কেউ কেউ তাঁকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু বলেন। হয়তো বুঝতে পারছো আমি ববি ফিশারের কথা বলছি। পুরো নাম রবার্ট জেমস ফিশার। ১৯৪৩ সালের ৭ মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। খুব বিতর্কিত এই দাবাড়ু শিকাগো শহরের বাসিন্দা ছিলেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি এমন একটি গেম খেলেন যাকে বলা হয় ''গেম অফ দি সেঞ্চুরি'। ১৯৬৩-৬৪ সালে ইউনাইটেড্ স্টেটস্ চ্যাম্পিয়নশিপে ১১ পয়েন্টের মধ্যে ১১ পয়েন্ট করেন। যা কিনা আমেরিকার চেস্ চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস। কারণ কেউ সমস্ত খেলা জিতে এভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়নি সে দেশে। ফিশারের লেখা 'My Memorable Games' একটি অপূর্ব সংকলন। ১৯৬৯ সালে ফিশারের লেখা এই বইটি আমিও পড়েছি। তোমরা বড়ো হয়ে বইটি অবশ্য অবশ্য সংগ্রহ করবে। ১৯৫৮ সালে গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব অর্জন করেন। ১৯৭২ সালে রাশিয়ার বরিস স্প্যাসকিকে হারিয়ে ববি ফিশার দাবাতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। এর সম্পর্কে পরের কোনো সংখ্যায় আরো অনেক কথা বলব।

চেস দাদু

এবার তোমাদের খেলার কথায় আসি। দাবা খেলায় প্রধানত তিনটি ভাগ তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এক নম্বর Chess opening মানে খেলা শুরু করা। ১৫-১৬ চাল ঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এরপর Middle game বলা হয় এখানে একজন দাবাড়ুর নিজস্ব ক্ষমতা বোঝা যায়। এবং শেষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'End game'। বুঝতেই পারছ এই End game মানে খেলার শেষ অংশ খুব গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণার বিষয় হতে পারে। ক্যাপাব্লাঙ্কা (Capablanka) নামে একজন কিউবার দাবাড়ু ছিলেন তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নও ছিলেন - বলা হয় ক্যাপাব্লাঙ্কা End game-এ ভীষণ রকম পারদর্শী ছিলেন। এবার কলকাতার নামকরা কয়েকটি চেস্ অ্যাকাডেমির কথা বলছি। যেমন - দিব্যেন্দু বড়ুয়া চেস্ আকাডেমি, অ্যালেখিন চেস্ ক্লাব, ক্যালকাটা চেস্ অ্যাকাডেমি। অনেক ছেলে-মেয়ে এসব অ্যাকাডেমিতে খেলা শিখতে যায়। এবং পরবর্তীতে খেলা শিখতে যায়। পরবর্তীকালে তারা ভালো খেলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন।

Chess Notation নিয়ে কিছু বলছি। একটা খেলা তুমি খেলছ। যদি লিখে রাখো বহু বছর পর তুমি নিজের খেলা আবার Chess Board-এ সাজিয়ে দেখতে পারো। এরজন্যই Chess Notation দরকার। ছোট্টো বন্ধুরা ভালো থেকে আরো ভালো করে খেলতে থাকো। এবং শরীরচর্চা কর। তোমাদের চেস্ দাদু তোমাদের সঙ্গে আছে।

বৃষ্টিতে কাকভেজা

জীবনে এমন কিছু কিছু দিন আসে যেগুলো পরবর্তীকালে খুব মনে পড়ে। সোমবার সকালে উঠে বারান্দায় যেতে দেখি মেঘটা রবিবারের মতো কালো নেই , রবিবারের মেঘটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন ভেজা তুলো। না চিপলে জল পড়বে না। যাই হোক সোমবারের মেঘটা মোটামুটি পরিস্কারই ছিল। তবে বারান্দায় যেতেই শীতল হাওয়া আমার গায়ের পাশাপাশি মনও যেন ছুঁয়ে গেল। 'দুগ্গা-দুগ্গা' বলে বাড়ি থেকে বার হলাম স্কুল ব্যাগ কাঁধে নিয়ে, যেন এক যুদ্ধের উদ্দেশে বেরিয়েছি। আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনই আমার কাছে যেন যুদ্ধ বলে মনে হয়। যাই হোক মেইন রোড অবধি পৌঁছালাম। কিন্তু কী যেন কী হলো, ভগবানের মনে হয় আমার উপর রাগ হল আর রাগের চোটে যেন নিজের চোখের জলে আমায় ভেজালেন। আরে এ কি কাণ্ড, কাঁদছো ভালো কথা তা বলে এরকম কান্না জীবনেও দেখিনি যে একজনকে এভাবে কাকভেজা বৃষ্টি ভেজায়। বারিষধারা নামল আর আমায় পুরো স্নান করিয়ে দিল যেন তিনি রাগের প্রতিশোধ নিলেন। কী অদ্ভুত! কখন কেন তাঁরা রাগেন বলাই মুস্কিল। সেদিন আমি আপাদমস্তক পুরো ভিজে গিয়েছিলাম, আর সেদিনই বাসটা হয়েছিল লেট। এরকম কাকভেজা বৃষ্টির অনুভূতি আমার ঐ দিনই প্রথম হল। আর ঐ দিনই মাথায় হাত দিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে জীবনেও এমন কোনো কাজ করব না যাতে ভগবান রেগে যান। অবশ্য বুঝব কী করে; কী করলে রাগ হবেন। যাই হোক, এরপর থেকে ছাতা ছাড়া আর বের হই নি। এ ভুল আহ্ন বার কেউ করে নাকি। কখন গগনের চোখে কাজল মাখবে আর পরে কাঁদবে তা বলা তো মুস্কিলই নয়, নামুমকিন্। যাই হোক ঐ দিন ক্লাসে ঢুকে জয় মা সরস্বতী বলে ক্লাসটাও কাটালাম, যুদ্ধে সেদিন জয়ী না হলেও আত্মসমর্পন করিনি।

অনিন্দ্য সাহা
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাইস্কুল
শ্রেণি : সপ্তম

দূর থেকে আসতে দেখলাম। মাঠ পেরিয়ে, গাছপালাগুলোকে অঝোর ধারায় স্নান করিয়ে, বাড়িগুলোর গা ভিজিয়ে দিয়ে, নেমে এল পথে। ভিজলাম আমরা, ভিজলো যত পথচারী। বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটাগুলো অবিশ্রান্ত ধারায় নেমে আসতে লাগলো। এ হলো কাকভেজা বৃষ্টি। যদি বৃষ্টি বিঘ্নিত দিন বলে স্কুল ছুটি দেয়, সে বড়ো আনন্দের হবে। ফিরবো ভিজতে ভিজতেই। রাস্তার দু'পাশে জলের স্রোত কীভাবে নালায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে পথ আর নালা একাকার হয়ে যায়, তা দেখার আনন্দই অন্যরকম। বাবারা যখন ছোটো ছিল তখন জমা জলে কাগজের নৌকা ভাসাত আর তা ভাসতে ভাসতে হারিয়ে যেত দূরে। আমাদের সে সুযোগ নেই। আমাদের ঠাণ্ডা লাগা চলবে না; পড়ার চাপ, স্কুল, পরীক্ষা, কোচিং। আমাদের মাথা ছাতায় ঢাকার আপ্রাণ চেষ্টা মায়েদের। আর স্কুলের মাঠে খালি গা, শীর্ণ চেহারার আমাদেরই সমবয়সি একদল ছেলে হৈ হৈ করে ফুটবল খেলতে নেমে গেছে। এই দিনটা যেন তাদের কাছে উৎসবের মতো। আমরাও যদি পারতাম, এই বৃষ্টির উৎসবে এরকমভাবে যোগ দিতে!

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রেণি : সপ্তম
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাইস্কুল

মেলে দিলেম ইচ্ছেডানা

আজ আকাশটা খুব মেঘলা তাই সকালে পড়তে না বসেই আজ হঠাৎ মন প্রকৃতিতে। শহরেও প্রকৃতি-প্রেম ভাবা যায়, প্রকৃতির কতই না রূপ ভাবতে ভাবতে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি নামল। মা চেঁচিয়ে বলেছিল— 'জানলা বন্ধ করে পড়তে বস।' সে কথা আর কে শোনে, হাতে ইতিহাস বইয়ে বাবরের জীবনী পড়তে পড়তে কখন প্রকৃতির রূপে মনোনিবেশ করেছি জানিনা। তবে জানলা বন্ধ করার ব্যাপারটা শুনিনি। জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখি চারিদিকটা যেন সাদা হয়ে গেছে। তার মধ্যেই উড়ে যেতে দেখলাম সাদা বককে। দেখলাম বাড়ির চালে অসহায় ভাবে কাকগুলোকে ভিজতে। শহরের দৃশ্য দেখে আমি খুব অবাক হলাম! রাস্তা ফাঁকা। এখন সবাই বৃষ্টির জলে ভিজবে না বলে ঘরে। মনে হল, আচ্ছা এই বৃষ্টির ফলে কত মানুষের লাভ হয়। শুকনো মাঠে এই বৃষ্টির ছোঁয়া যেন কৃষকের ঝরানো ঘামকে কার্যকর করে। আবার আমরাই এই বৃষ্টিতে খুব খারাপ অনুভব করি, কারণ, রাস্তায় জল জমা, মাঠে কাদা হওয়া যেন সত্যিই অসহ্য। আবার এই বৃষ্টিই গ্রামে আনে চরম আনন্দ। আবার কোথাও হয় বন্যা। তাই এই বৃষ্টিই প্রমাণ করে মানুষের সীমাবদ্ধতা ও কাজের পার্থক্য অনুসারে সত্যিই মানুষ বিভিন্ন ভাবে প্রকৃতিকে অনুভব করে। তাই আজ যেন কাজের ভিত্তিতে পৃথিবী বিভক্ত। এ সময় হঠাৎ শুনি মায়ের ডাক- 'খেয়ে নিবি আয়, অনেক পড়েছিস।' বুঝতে পারিনি কখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

শাশ্বত ঘোষ
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাইস্কুল
শ্রেণি : সপ্তম

প্রকৃতি অদ্ভুত। সে কখনো গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে দারুণ অগ্নিবাণে আবার কখনো শীতের ঠাণ্ডা আমেজ। প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বর্ষা। যে রিমঝিম বৃষ্টি কবির মন রাঙিয়ে দেয়, তাকে উদ্বুদ্ধ করে শিল্প সৃষ্টিতে। কবির মন বলে ওঠে, 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে'....।

তবে কাকভেজা বৃষ্টি একটু অন্যরকম। বৃষ্টিতে ভিজলে কাকেদের যেরূপ 'সুশ্রী' চেহারা হয় আমাদেরও সেই রকম অবস্থা হয়। যদিও এরকম অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিভাণ্ডারে কমই আছে, কারণ দু-এক ফোঁটা পড়তেই ছাতাও চলে আসে মাথার উপর। তবুও একদিন আমার এইরকম অবস্থা হয়েছিল। সেদিন ছিল চৈত্র সংক্রান্তি। আকাশ নীল বলে ছাতা সঙ্গে নিয়ে বেরোইনি। আর তারপর ঝম-ঝম-ঝম-ঝম। বেশ আনন্দ করে চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় ঘুরছিলাম। মাথা বাঁচাতে দে ছুট। কিন্তু 'ছুট' বললেই তো আর ছোটা যায় না। খনিকটা হেঁটে, খানিকটা লাফিয়ে এগোতে লাগলাম। বাড়ি গিয়ে মনে হল আজ নিউমোনিয়া না হয়ে যায়। কিন্তু সে যাত্রায় রক্ষে পেয়েছিলাম। তবে কাকভেজা বৃষ্টি মানে যে শুধু ভিজতে হবে তা নয়, বৃষ্টি হওয়ার আগের মুহূর্তে ঝোড়ো হাওয়া বা মেঘের গর্জনের সাথে কাকেদের চেঁচামেচিও কানে আসে। হয়তো তারা নিজেদের বাসায় ফিরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় তাদের গায়ের পালকগুলি একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই অবস্থাতেই এমন ঠোঁট দিয়ে নিজেদের গা ঘষে যেন মনে হয় শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে সাবান মেখে স্নান করছে। লিখতে লিখতে বেশ দেখতে পাচ্ছি ওই দুরে বাড়ির কার্নিশে কাকটা বসে ভিজে নেতিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে মাথা শরীর প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকাচ্ছে। দেখতে তো বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু আমরা বুঝিনা কাকটার কত কষ্ট। আমরা নিজেরা এরকম বৃষ্টিতে ভিজলে সোজা সাতদিন বিছানায় শুয়ে থাকতাম। আমার খুব ইচ্ছে করে, এইভাবে ঐ কাকটার মত একদিন, সত্যিকারের ঐ কাকটার মতন করে একদিন ভিজতে। অনাবিল আনন্দের আস্বাদ নিতে। মা-বাবার চোখ রাঙানির ভয়ে আমরা তো বৃষ্টিতে ভেজার সুযোগ পাই না। তাই কেবল 'রচনা' লেখার সময় মিথ্যে মিথ্যে বৃষ্টি ভেজার অভিজ্ঞতা লিখ তে হয়। আমি সত্যি বৃষ্টিতে ভিজতে চাই। হ্যাঁ! ওই পালক ওঠা কাকটার মতো। সত্যি! ওই কাকটার সঙ্গে আমিও একটু বৃষ্টি গায়ে মেখে নিতে চাই।

রাজদীপ দত্ত
শ্রেণি : সপ্তম
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাইস্কুল

জুন মাসের শেষের দিকের কথা। আকাশে ঘন কালো মেঘ। ঘড়ি বলছে তিনটে দশ বাজে। ঢং ঢং করে বাজল সিক্সথ্ পিরিওডের ঘণ্টা। অঙ্ক স্যার বেরিয়ে গেলেন ক্লাস থেকে। আমিও নিশ্চিন্ত মনে তাকালাম জানালার বাইরে। কালো আকাশের মাঝে দোদুল্যমান সবুজের রাশি। আমার মন উড়ে চলল 'দিগ্‌দিগন্তের পানে, নিঃসীম শূন্যে'। যদিও শ্রাবণ এখনো আসেনি।

দেখতে দেখতে সময়ের কথা আর মাথায় নেই। কখন যে বাংলা স্যার এলেন, তা টের পেলাম না। যাই হোক, স্যার বললেন, একটি বর্ষামুখর দিন সম্পর্কে রচনা লিখতে। আমি খুব অখুশি হলাম। কিন্তু এটা ভেবে খুশিও হলাম যে, রচনাটা লিখতে আমায় বাইরে তাকাতেই হবে। বাইরের পরিবেশটা খাতায় ফুটিয়ে তুললেই তো হল। তাই, শুরু হল কাজ। তবে, দমকা হাওয়ায় খাতাটা সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ছিল। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। বাইরের আকাশ, বাতাস, সবুজের রাশি - এক এক করে লিখলাম। হঠাৎ, চোখে পড়ল একটি কাক। সে আশ্রয় খুঁজছে, জানে সে, দুর্যোগ আসন্ন। খুব মজাদার বিষয় মনে হল। লেখা ছেড়ে সাময়িক ভাবে মন দিলাম কাকের চলাফেরার উপর। হঠাৎ খুব বেশি হাওয়া দিতে লাগল। পাশে কোথাও যেন দড়াম্ দড়াম্ দরজার শব্দ হতে শুরু করল। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জল এসে পড়ছে খাতার উপর। মনে মনে খুব উৎফুল্ল হলাম। কিন্তু, আমার অলক্ষ্যেই ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল কাকটি।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগছিল। ঐ অবস্থায় সুদীর্ঘ আর একটি পিরিওড পর ছুটি হল। প্রকৃতির দৃশ্যে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে, সময়ের জ্ঞানই ছিল না। বেরনোর সময় বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে আবার দেখ লাম ঐ কাককে। কার্নিশের তলায় আশ্রয় নিয়েছে সে। তবে একেবারে ভিজে চুপচাপ হয়ে গেছে।

বৃষ্টি একটু ধরেছে দেখে আর ছাতা খুললাম না। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে এল বিপত্তি। ঝমঝম বৃষ্টিতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে কোনো বাসে উঠে পড়েছি। পরে দেখি এ বাস অন্য রুট দিয়ে যায়। ফলে, নেমে অনেকটা হাঁটতে হবে। তাই ছাতা খুঁজতে গিয়ে দেখি, ছাতা তো ব্যাগে নেই। অগত্যা বাস থেকে নেমে রুমাল মাথায় দিয়ে বাড়ি পৌঁছলাম চুপচুপে ভিজে। মা দেখে বললেন, 'কি-রে? ছাতা নিয়ে যাসনি তো! দেখো কেমন কাকভেজা ভিজেছে!' কাকভেজা। এই একটা শব্দ যেন নতুন শুনলাম আমি। সত্যিই, আমি তো সেই কাকটার মতোই ভিজেছি। বৃষ্টিতে আশ্রয়হীন কাক আর ছাতাহীন আমি-র মধ্যে পার্থক্য কী আছে? আমি তাই কাকভেজা। এই দিনটা আমি ভুলব না কখনো। আর ব্যাগে ছাতা রাখ তে তো কখনই নয়। আমার ক্ষুদ্র অভিধানে নবতম সংযোজন — 'কাকভেজা'।

প্রতিক বসু
শ্রেণি— সপ্তম
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হাইস্কুল

কচি পাতা

পরীক্ষার পড়া

আসছে পরীক্ষার দিন
এখনও নাচছি তা ধিন্ ধিন্।
মা তো রোজ বকেই সারা
বাবাও আজকাল দিচ্ছে তাড়া।
রোজ রোজ এই পড়াশোনা
চলছে পরীক্ষার দিন গোনা।
বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি তিনটে ভাষা
পড়া রয়েছে ঠাসা ঠাসা।
অঙ্কতে আমি পাই যে ভয়
ইতিহাসের সাল তারিখ পাতায় পাতায় রয়।
আই. সি. তে গীতার খটখটানি
ভয়ঙ্কর হল দুই বিজ্ঞান।
ভুগোলের বই দেখে আমি অজ্ঞান।
খেলাধুলা নেই সে সময়
টিভি মুখ ফিরিয়ে নেয়।
কী যে হবে ভাই?
পরীক্ষার আর দেরি নাই।

শুভঙ্কর সাহা
পঞ্চম শ্রেণি
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়

বৃষ্টি

পড়তে পড়তে একদিন হঠাৎ এল বৃষ্টি
আমি ভাবি পরিবেশের এ কী অনন্য সৃষ্টি
আকাশে ছিল সূর্য হেসে হেসে
কোথা থেকে মেঘ এল ভেসে ভেসে
শুরু হয়ে গেল ঝড়
আমার শিক্ষক বললেন, তাও তুই পড়।
এবার শুরু হল বাজ
ভাঙতে লাগল আমাদের বাড়ির কাচ
পড়ল শেষে এমন জোরে বাজ
কানে বুঝি আমার তালা লাগল আজ।
বাড়িতে শুরু হল খিচুড়ি রাঁধা
বাজ পড়ে পাশের বাড়ির ছেলেটার শুরু হল কাঁদা;
শুরু হয়ে গেল ব্যাঙের ডাকা
বাজারে মাছ আনতে গেলেন ছোটো কাকা।
বর্ষাতে শুনলাম নাকি চাষিরা নেমে গেছে মাঠে
ইলিশ ধরা পড়ছে ঘাটে ঘাটে,
শুনলাম নাকি বেড়ে গেছে সাপ
জানলা দিয়ে ডাকছে একটি ভেজা কাক।
রাস্তায় দেখলাম জমে গেছে জল,
মাটিতে দেখলাম লাইন দিয়ে যাচ্ছে পিঁপড়ের দল;
হঠাৎ বৃষ্টি গেল থেমে
সবকিছুই তখন গেল কমে।
আমার শিক্ষকও চলে গেলেন নিজের বাড়ি
ভাবলাম এবার আমি কী করি?

রাহুল গাঙ্গুলী
চতুর্থ শ্রেণি
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়

রাবণ

রামায়ণে রাবণের
মাথা ছিল কয়টা?
দশটা মাথা ছিল, স্যার
বলে গুড বয়টা।
পিছে ছিল ব্যাড বয়
বুকে নেই ভয়টা,
বলে ওঠে - রাবণের
চোখ ছিল কয়টা?
কাঁচুমাঁচু মুখ করে
স্যার বলে, 'দুত্তোর'
রামায়ণ খুঁজে দেখ
পেয়ে যাবি উত্তর।

দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়
পঞ্চম শ্রেণি
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়

বাঘহারা দুনিয়া

কিচিরমিচিরের বাঘসংখ্যা পড়ে খুবই ভালো লাগলো। বেশ কিছু তথ্য থাকায় সংগ্রহে রাখার মতোই হয়েছে। বাঘ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের গবেষণার অন্ত নেই। এখন সবথেকে বড়ো চিন্তার বিষয় হয়েছে বাঘের সংখ্যা হ্রাস। বহুদিন আগে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন,

বাঘ ছিল ক্ষত্রিয়,
বাঘ ছিল শ্রেষ্ঠ,
বীরেদের মধ্যে বাঘ ছিল জ্যেষ্ঠ,
মনে ভেবে ব্যথা পাই বাঘের অদেষ্ট।
মুনু-মুনু-মুনিয়া,
শিকারি নয় তো ওরা
ওরা সব খুনিয়া,
মেরে মেরে করবেই
বাঘ হারা দুনিয়া।

আজকে খারাপই লাগে যে সত্যিই পৃথিবী বাঘহারা হতে চলেছে। অন্নদাশঙ্কর কবে বলেছিলেন, এখনও আমরা সচেতন হলাম না!

সুস্নাত চক্রবর্তী
শ্রেণি- একাদশ (কলা),
উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ, হুগলি।

আঁকি-বুঁকি

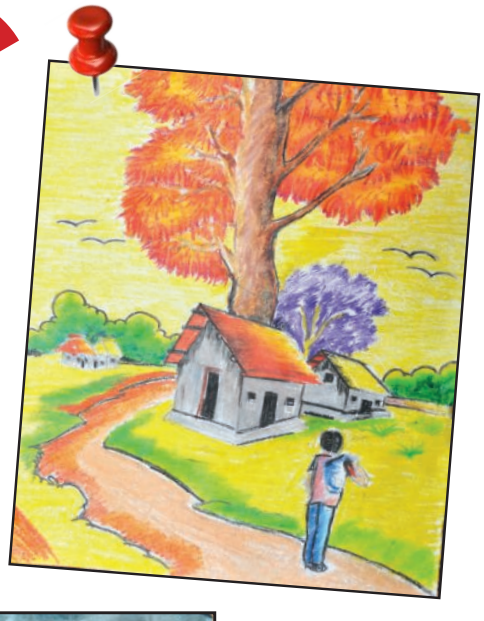

শুভব্রত কুণ্ডু
শ্রেণি - পঞ্চম,
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়

দিব্যজ্যোতি দত্ত
শ্রেণি - চতুর্থ,
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়

তোমাদের জন্য এই প্রতিযোগিতা। প্রতি সংখ্যায় আমরা দেবো একটি কাল্পনিক বিষয়। তোমাদের কাজ হবে সেই বিষয়ের ওপর **২০০** শব্দের মধ্যে লিখে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া। চুপিচুপি বলে রাখি, বাবা-মা বা বড়োদের সাহায্য নিলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পেরে যাবো। লেখা হলেই আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। খামের ওপর লিখবে -

মেলে দিলেম ইচ্ছেডানা
প্রযত্নে - **কিচির মিচির,**
৯, কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১

পাঠাতে পারো ই-মেল করেও। আমাদের ই-মেল - kichirmichirkol@gmail.com। লেখা পাঠাতে হবে ফুলস্কেপ কাগজের একপিঠে। দু'পাশে যথেষ্ট ছাড় দিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে। নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণি পরিস্কার করে উল্লেখ করবে।

: প্রতিযোগিতার বিষয় :

ডিসেম্বরে দুর্গাপুজো : কেমন হবে?

কিচির মিচির-এর পক্ষে রিমা ঘোষদত্ত কর্তৃক ৯, কৈলাস ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং তাজ এন্টারপ্রাইজ, ৬ মণীন্দ্র মিত্র রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদীপ্ত চক্রবর্তী।
E-mail : kichirmichirkol@gmail.com, সম্পাদনা ও বিজ্ঞাপন : ৯৮৩০০৭৭২০৫/৯৩৩০৮০৮৯০০, বিপণন : ৮০১৭১৫৫৪১৭ Title registration - WBBEN14929/25/1/2014-TC.